KOLKATA (CALCUTTA) BOARD
For more e-books in bengali please visit: http://www.calcuttaglobalchat.net/invboard
Note: This pdf is not a product of Kolkata Board and the administrators may remove the content without any notification.

Kolkata Radio: http://www.kolkataradio.calcuttaglobalchat.net
Kolkata Photoalbum: http://www.calcuttaglobalchat.net/cgc-album
Kolkata Music Blog: http://www.calcuttaglobalchat.net/calcuttablog
Kolkata Information center: http://www.calcuttaglobalchat.net/kolkata-info
Official Home page: http://www.calcuttaglobalchat.net

হিমুর দ্বিতীয় প্রহর

হুমায়ূন আহমেদ

কাকলী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ১৯৯৭

©
গুলতেকিন আহমেদ

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

কম্পিউটার কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটারস্
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এস. আর. প্রিন্টার্স
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

পরিবেশক
সৃজনশীল পাবলিশার্স গিল্ড
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দাম ৭৫ টাকা

ISBN 984 437 145 7

Books Asia
LIBRARY & SCHOOL SUPPLIERS
107 MANNINGHAM LANE
BRADFORD, WEST YORKSHIRE
BD1 3BN
TEL: 01274 721871
FAX: 01274 738323

7769

উৎসর্গ

জাহিদ হাসান, প্রিয় মানুষ

মানুষ হিসেবে সে আমাকে মুগ্ধ করেছে,
একদিন হয়ত অভিনয় দিয়েও মুগ্ধ করবে।
(দ্বিতীয় বাক্যটি দিয়ে তাকে রাগিয়ে দিলাম, হা হা হা।)

984-437-145-7
METROPOLITAN
BRADFORD LIBRARIES
01 JUN 1998
RC KEI BA
B17.812.462 8

কাকলী কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

দ্বৈরথ
হোটেল গ্রেভার ইন
সমুদ্র বিলাস
গৌরীপুর জংশন
আমার ছেলেবেলা
ভূত ভূতং ভূতৌ
গল্প সমগ্র
নি
স্বনির্বাচিত উপন্যাস
কোথাও কেউ নেই
জনম জনম
কিশোর সমগ্র
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে
অনন্ত নক্ষত্র বিথী
কোয়ান্টাম রসায়ন
এই আমি
আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই
সকল কাঁটা ধন্য করে
কবি
অনন্ত অম্বরে
গৃহত্যাগী জোছনা

অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম হিমুর সঙ্গে মিসির আলির দেখা করিয়ে দেব। দু'জন মুখোমুখি হলে অবস্থাটা কি হয় দেখার আমার খুব কৌতূহল। ম্যাটার এবং এন্টিমেটার একসঙ্গে হলে যা হয় তার নাম 'শূন্য'। মিসির আলি এবং হিমুওতো এক অর্থে ম্যাটার এবং এন্টিম্যাটার। দু'টি চরিত্রের ভেতর কোনটিকে আমি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা জানার জন্যেও এদের মুখোমুখি হওয়া দরকার। হিমুর দ্বিতীয় প্রহরে এদের মুখোমুখি করিয়ে দিলাম।

হুমায়ূন আহমেদ
২৫-২-৯৭

ভীতু মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তা না। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলে আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যদি শুনি বাথরুমে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে—কে যেন হাঁটছে গুনগুন করে গান গাইছে, কল ছাড়ছে-বন্ধ করছে। তাতেও আতঙ্কগ্রস্ত হই না। একবার ভূত দেখার জন্যে বাদলকে নিয়ে শ্মশান ঘরে রাত কাটিয়েছিলাম। শেষরাতে ধুপধাপ শব্দ শুনেছি। চারদিকে কেউ নেই অথচ ধুপধাপ শব্দ। ভয়ের বদলে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমার বাবা তার পুত্রের মন থেকে 'ভয়' নামক বিষয়টি পুরোপুরি দূর করার জন্যে নানান পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। পদ্ধতিগুলি খুব যে বৈজ্ঞানিক ছিল তা বলা যাবে না, তবে পদ্ধতিগুলি বিফলে যায়নি। কাজ কিছুটা করেছে। চট করে ভয় পাই না।

রাত-বিরেতে একা একা হাঁটি। কখনো রাস্তায় আলো থাকে, কখনো থাকে না। বিচিত্র সব মানুষ এবং বিচিত্রসব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি— কখনো আতঙ্কে অস্থির হই নি। তিন চার বছর আগে এক বর্ষার রাতে ভয়ংকর একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। রাত দু'টা কিংবা তারচে কিছু বেশি বাজে। আমি কাটাবনের দিক থেকে আজিজ মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। চারপাশ জনমানব শূন্য। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছি। খুবই মজা লাগছে। মনে হচ্ছে সোডিয়াম ল্যাম্পগুলি থেকে সোনালী বৃষ্টির ফোটা পড়ছে। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি— প্যান্ট এবং শাদা গেঞ্জি পরা একজন মানুষ আমার দিকে ছুটে আসছে। রক্তে তার শাদা গেঞ্জি, হাত-মুখ মাখামাখি—ছুরিতেও রক্ত লেগে আছে। বৃষ্টিতে সেই রক্ত ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। মানুষটা কি কাউকে খুন করে এদিকে আসছে? খুনি কখনো হাতের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে পালায় না। ব্যাপার কী? লোকটা থমকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। স্ট্রীট লাইটের আলোয় আমি সেই মুখ দেখলাম। সুন্দর শান্ত মুখ, চোখ দু'টিও মায়াকাড়া ও বিষণ্ণ। লোকটির চিবুক বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। লোকটা চাপা গলায় বলল, কে? কে?

আমি বললাম, আমার নাম হিমু।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত অপলকে তাকিয়ে রইল। এই কয়েক মুহূর্তে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। অস্ত্র-হাতে খুনি ভয়ংকর জিনিস। যে-অস্ত্র মানুষের রক্ত পান

করে সেই অস্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সে বারবার রক্ত পান করতে চায়। তার তৃষ্ণা মেটে না।

লোকটি আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি একই জায়গায় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমি খবরের কাগজ পড়ি না—পরদিন সব ক'টা কাগজ কিনে খুঁটিয়ে পড়লাম। কোনো হত্যাকণ্ডের খবর কি কাগজে উঠেছে? ঢাকা নগরীতে নিউ এলিফেন্ট রোড এবং কাঁটাবন এলাকার আশেপাশে কাউকে কি জবাই করা হয়েছে? না, তেমন কিছু পাওয়া গেল না। গতরাতে আমি যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই জায়গায় আবার গেলাম। ছোপ ছোপ রক্ত পড়ে আছে কি না সেটা দেখার কৌতূহল। রক্ত দেখতে না পাওয়ারই কথা। কাল রাতে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে। যেসব রাস্তায় পানি ওঠার কথা না সেসব রাস্তাতেও হাঁটুপানি।

আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম—না, রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। আমার অনুসন্ধান অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাঙালির দৃষ্টি বড় কোনো ঘটনায় আকৃষ্ট হয় না ছোট ছোট ঘটনায় আকৃষ্ট হয়। একজন এসে অমায়িক ভঙ্গিতে বলল, ভাইসাহেব, কী খুঁজেন?

'কিছু খুঁজি না।'

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার অনুসন্ধান দেখতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আর রক্তের দাগ খোঁজা অর্থহীন। আমি চলে এলাম। ঐ রাতের ঘটনা ভয় পাবার মতো ঘটনা তো বটেই— আমি ভয় পাই নি। বাবার ট্রেনিং কাজে লেগেছিল। কিন্তু ভয় আমি একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়ে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। ভয়াবহ ধরণের ভয় যা মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। যে ভয়ের জন্ম এই পৃথিবীতে না, অন্য কোন ভুবনে। ভয় পাবার সেই গল্পটি আমি বলব।

আমার বাবা আমার জন্যে কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছেন। সেই উপদেশগুলির একটি ভয়-সম্পর্কিত।

"একজন মানুষ তার এক জীবনে অসংখ্যবার তীব্র ভয়ের মুখোমুখি হয়। তুমিও হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। ভয়কে পাশ কাটাইয়া যাইবার প্রবণতাও স্বাভাবিক প্রবণতা। তুমি অবশ্যই তা করিবে না। ভয় পাশ কাটাইবার বিষয় নহে। ভয় অনুসন্ধানের বিষয়। ঠিকমতো এই অনুসন্ধান করিতে পারিলে জগতের অনেক অজানা রহস্য সম্পর্কে অবগত হইবে। তোমার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তোমাকে বলিয়া রাখি এই জগতের রহস্য পেঁয়াজের খোসার মতো। একটি খোসা ছাড়াইয়া দেখিবে আরেকটি খোসা। এমন ভাবে চলিতে থাকিবে— সবশেষে দেখিবে কিছুই নাই। আমরা শূন্য হইতে আসিয়াছি, আবার শূন্যে

ফিরিয়া যাইব। দুই শূন্যের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা বাস করি। ভয় বাস করে দুই শূন্যে। এর বেশি এই মুহূর্তে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।"

আমার বাবা মহাপুরুষ তৈরির কারখানার চিফ ইনজিনিয়ার সাহেব যদিও আমাকে বলেছেন ভয়কে পাশ না-কাটাতে, তবুও আমি ভয়কে পাশ কাটাচ্ছি। সব ভয়কে না— বিশেষ একটা ভয়কে। আচ্ছা ঘটনাটা বলি।

আমার তারিখ মনে নেই। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে পারে। শীত তেমন নেই। আমার গায়ে সুতির একটা চাদর। কানে ঠাণ্ডা লাগছিল বলে চাদরটা মাথার উপর পেঁচিয়ে দিয়েছি। আমি বের হয়েছি পূর্ণিমা দেখতে। শহরের পূর্ণিমার অন্যরকম আবেদন। সোডিয়াম ল্যাম্পের হলুদ আলোর সঙ্গে মেশে চাঁদের ঠাণ্ডা আলো। এই মিশ্র আলোর আলাদা মজা। তার উপর যদি কুয়াশা হয় তা হলে তো কথাই নেই। কুয়াশায় চাঁদের আলো চারদিকে ছড়ায়। সোডিয়াম ল্যাম্পের আলো ছড়ায় না। মিশ্র আলোর একটি ছড়িয়ে যাচ্ছে অন্যটি ছড়াচ্ছে না- খুবই ইন্টারেস্টিং।

সেরাতে সামান্য কুয়াশাও ছিল। মনের আনন্দেই আমি শহরে ঘুরছি। পূর্ণিমার রাতে লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি। অল্প কিছু মানুষ সারারাত জাগে। তারা ঘুমুতে যায় চাঁদ ডুবার পড়ে।

ইংরেজিতে এই ধরনের মানুষদের একটা নাম আছে Moon Struck. এরা চন্দ্রাহত। এদের চলাফেরায় ঘোর-লাগা ভাব থাকে। এরা কথা বলে অন্যরকম স্বরে। এরা কিন্তু ভুলেও চাঁদের দিকে তাকায় না। বলা হয়ে থাকে চন্দ্রাহত মানুষদের চাঁদের আলোয় ছায়া পড়ে না। এদের যখন আমি দেখি তখন তাদের ছায়ার দিকে আগে তাকাই।

অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলাম। এক সময় মনে হল সোডিয়াম ল্যাম্পের আলো বাদ দিয়ে জোছনা দেখা যাক। কোনো একটা গলিতে ঢুকে পড়ি। দুটা রিকশা পাশাপাশি যেতে পারে না এমন একটা গলি। খুব ভাল হয় যদি অন্ধগলি হয়। আগে থেকে জানা থাকলে হবে না। হাঁটতে হাঁটতে শেষ মাথায় চলে যাবার পর হঠাৎ দেখব পথ নেই। সেখানে সোডিয়াম ল্যাম্প থাকবে না- শুধুই জোছনা।

ঢুকে পড়লাম একটা গলিতে। ঢাকা শহরের মাঝখানেই এই গলি। গলির নাম বলতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি না কৌতূহলী কেউ সেই গলি খুঁজে বের করুক। কিছুদূর এগুতেই কয়েকটা কুকুর চোখে পড়ল। এরা রাস্তার মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল—আমাকে দেখে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সব মিলিয়ে চারটা কুকুর। কুকুরদের স্বভাব হচ্ছে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে একসঙ্গে ঘেউঘেউ করে ওঠা। ভয় দেখানোর চেষ্টা। এরা তা করল না। এদের একজন সামান্য একটু এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। বাকি তিনজন তার পেছনে। সামনের কুকুরটা কি ওদের দলপতি? লীডারশিপ ব্যাপারটা কুকুরদের আদিগোত্র

নেকড়েদের মত আছে। কুকুরদের নেই। তবে সামনের কুকুরটাকে লীডার বলেই মনে হচ্ছে—। আমি ভাব জমাবার জন্য বললাম, তারপর তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? মনমরা হয়ে শুয়ে আছ? Is anything wrong ?

কুকুরদের শরীর শক্ত হয়ে গেল। এরা কেউ লেজ নাড়ছে না। কুকুর প্রচণ্ড রেগে গেলে লেজ নাড়া বন্ধ করে দেয়। লক্ষণ ভাল না।

এদের অনুমতি না নিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পরা ঠিক হবে না। কাজেই বিনয়ী গলায় বললাম, যেতে পারি?

আমার ভাষা না বুঝলেও গলার স্বরের বিনয়ী অংশ বুঝতে পারার কথা। অধিকাংশ পশুই তা বোঝে।

এরা নড়ল না। অর্থাৎ এরা চায় না আমি আর এগুই। তখন একটা কাণ্ড হল— আমি স্পষ্টই শুনলাম কেউ একজন আমাকে বলছে—তুমি চলে যাও। জায়গাটা ভাল না— তুমি চলে যাও। চলে যাও।

অবচেতন মনের কোনো খেলা? কোনো কারণে আমি নিজেই গলিতে ঢুকতে ভয় পাচ্ছি বলে আমার অবচেতন মন আমাকে চলে যেতে বলছে। না, ব্যাপারটা তা না। আমি না ভাবার কোন কারণ নেই। আসলেই গলির ভেতর ঢুকতে চাচ্ছি। আমাকে গলির ভেতরের জোছনা দেখতে হবে। তারচে বড় কথা হচ্ছে আমি কোনো দুর্বল মনের মানুষ না যে অবচেতন মন আমাকে নিয়ে খেলবে। আর যদি খেলেও থাকে সেই খেলাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। ধরে নিলাম অবচেতন মনই আমাকে চলে যেতে বলছে— অবচেতন মনকে শোনানোর জন্যেই স্পষ্ট করে বললাম, আমার এই গলিতে ঢোকা অত্যন্ত জরুরি। কুকুরগুলি একসঙ্গে আমাকে কামড়ে না ধরলে আমি অবশ্যই যাব।

তখন একটা কাণ্ড হল। সব ক'টা কুকুর একসঙ্গে পেছনের দিকে ফিরল। দলপতি কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে দলপতির আসন নিল। তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেও সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পরিবর্তনটা কী বোঝার চেষ্টা করছি তখন অস্পষ্টভাবে লাঠির ঠকঠক আওয়াজ কানে এল। লাঠি-হাতে কেউ কি আসছে? গ্রামের মানুষ সাপের ভয়ে লাঠি ঠকঠক করে যেভাবে পথে হাটে তেমন করে কেউ একজন হাঁটছে। পাকা রাস্তায় লাঠির শব্দ। কুকুরদের শ্রবণেন্দ্রীয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তারা কি শব্দের মধ্যে বিশেষ কিছু পাচ্ছে? এদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা গেল। অস্থিরতা সংক্রামক। আমার মধ্যেও সেই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। আর তখনই আমি জিনিসটা দেখলাম। লাঠি ঠকঠক করে একজন 'মানুষ' আসছে। তাকে মানুষ বলছি কেন? সেকি সত্যি মানুষ? সে কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল। চারটা কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠে থেমে গেল। তারা একটু পিছিয়ে গেল।

আমি দেখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখ, নাক,

মুখ, কান কিছুই নেই। ঘাড়ের উপর যা আছে তা একদলা হলুদ মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু না। সেই মাংসপিণ্ডটা চোখ ছাড়াও আমাকে দেখতে পেল সে, লাঠিটা আমার দিকে উঁচু করল। আমি দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা লক্ষ করলাম তা হচ্ছে চাঁদের আলোয় লাঠিটার ছায়া পড়েছে, কিন্তু 'মানুষটা'র কোনো ছায়া পড়ে নি। ধ্বক করে নাকে পচা মাংসের গন্ধ পেলাম। বিকট সেই গন্ধ। পাকস্থলি উল্টে আসার উপক্রম হল।

আমার মাথার ভেতর আবারও কেউ একজন কথা বলল, এখনও সময় আছে, দাঁড়িয়ে থেকো না, চলে যাও। এই জিনিসটা যদি তোমার দিকে হাঁটতে শুরু করে তা হলে তুমি আর পালাতে পারবে না। কুকুরগুলি তোমাকে রক্ষা করছে। আরও কিছুক্ষণ রক্ষা করবে। তুমি দৃষ্টি না ফিরিয়ে নিয়ে পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করো। খবর্দার, এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবে না। এবং মনে রেখো আর কখনো এই গলিতে ঢুকবে না। কখনো না। এই গলি তোমার জন্যে নিষিদ্ধ।

আমি আস্তে আস্তে পেছন দিকে হাঁটছি—কুকুরগুলিও আমার হাঁটার তালে তাল মিলিয়ে পেছন দিকে যাচ্ছে।

জিনিসটার কোনো চোখ নেই। চোখ থাকলে বলতাম— জিনিসটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য চোখ ছাড়াও তা হলে দেখা যায়!

মাথার ভেতর আবারও কেউ একজন কথা বলল, তুমি জিনিসটার সীমার বাইরে চলে এসেছ। জিনিসটার ক্ষমতা প্রচণ্ড। কিন্তু তার ক্ষমতার সীমা খুব ছোট। এই গলির বাইরে আসার তার ক্ষমতা নেই। তুমি এখন চলে যেতে পার।

আমি চলে গেলাম না। জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে তার লাঠি নামিয়ে ফেলেছে। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার গায়ে কাঁথার মত একটা মোটা কাপড়। এই কাপড়টাই শরীরে জড়ানো। সে হাটছে হেলেদুলে। একবার মনে হচ্ছে বামে হেলে পড়ে যাবে, আবার মনে হচ্ছে ডানে হেলে পড়ে যাবে। জিনিসটাকে এখন আগের চেয়ে অনেক লম্বা দেখাচ্ছে। যতই সে দূরে যাচ্ছে ততই লম্বা হচ্ছে। জিনিসটা আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। কুকুরগুলি ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওদের দলপতি শুধু একবার আমার দিক তাকিয়ে ঘেউঘেউ করল। মনে হয় কুকুরের ভাষায় বলল, যাও, বাসায় চলে যাও।

ডিসেম্বর মাসের শীতেও আমার শরীর ঘামছে। হাঁটার সময় লক্ষ্য করলাম ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। রাস্তা কেমন উঁচুনিচু লাগছে। নতুন নতুন চশমা পরলে যা হয় তা-ই হচ্ছে। বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কাচের জগভরতি একজগ ঠাণ্ডা পানি এক চুমুকে খেতে পারলে হত। কার কাছে পানি চাইব? কিছুক্ষণ হাঁটার পর মনে হল আমার দিক-ভুল হচ্ছে। আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছি না। কোনদিকে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। রিকশা চোখে

পড়ছে না যে কোন একটা রিকশায় উঠে বসব। হোঁস হোঁস করে কিছু গাড়ি চলে যাচ্ছে। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে এরা কেউ কি থামাবে? না, কেউ থামাবে না। ঢাকার গাড়ি-যাত্রীরা পথচারীর জন্যে গাড়ি থামায় না। নিয়ম নেই। আমি ফুটপাতেই বসে পড়লাম। আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে বমি চেপে রেখেছিলাম। বসামাত্রই হড়হড় করে বমি হয়ে গেল।

'আফনের কী হইছে?'

মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। ফুটপাতে বস্তা মুড়ি দিয়ে যারা ঘুমায় তাদের একজন। বস্তার ভেতর থেকে মাথা বের করেছে। তার গলায় মমতার চেয়ে বিরক্তি বেশী।

আমি বললাম, শরীর ভাল না।

'মিরগি ব্যারাম আছে?'

'না। পানি খাওয়া যাবে—? পানি খাওয়া দরকার।'

'রাইতে পানি কই পাইবেন?'

'রাতে পানির পিপাসা পেলে আপনারা পানি কোথায় পান?'

লোকটা বস্তার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল। আমার উদ্ভট প্রশ্নে সে হয়তো বিরক্ত হচ্ছে। প্রশ্নটা তেমন উদ্ভট ছিল না। এই যে অসংখ্য মানুষ ফুটপাতে ঘুমায়? রাতে পানির তৃষ্ণা পেলে তারা পানি পায় কোথায়?

ক'টা বাজছে জানা দরকার। রাত শেষ হয়ে গেলে রিকশা বেবিট্যাক্সি চলা শুরু করবে—তখন আমার একটা গতি হলেও হতে পারে। বিটের পুলিশও দেখছি না। পূর্ণিমা রাতে বোধহয় বিটের পুলিশ বের হয় না।

আমি বস্তা মুড়ি দেয়া লোকটার দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, ভাইসাহেব! এই যে ভাইসাহেব! এই যে বস্তা ভাইয়া।

একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। বমি হয়ে যাওয়ায় শরীরটা একটু ভাল লাগছে তবে ভয়টা মাথার ভেতরে ঢুকে আছে।

কারও সঙ্গে কথাটথা বলতে থাকলে হয়তোবা তাকে ভুলে থাকা যাবে। আমি গলা উচিয়ে ডাকলাম, এই যে বস্তা ভাই, ঘুমিয়ে পড়লেন?

লোকটা বিরক্ত মুখে বস্তার ভেতর থেকে মুখ বের করল।

'কী হইছে?'

'এটা কোন জায়গা? জায়গাটার নাম কী?'

'চিনেন না?'

'জ্বি না।'

'বুঝছি, মাল খাইয়া আইছেন। আরেক দফা গলাত আঙ্গুল দিয়া বমি করেন— শইল ঠিক হইব। আরেকটা কথা কই ভাইজান, আমারে ত্যক্ত করবেন না।'

'রাত কত হয়েছে বলতে পারেন?'

'জ্বে না, পারি না।'

লোকটা আবার বস্তার ভেতর ঢুকে গেল। লোকটার পাশে খালি জায়গায় শুয়ে পড়ব? গায়ে চাদর আছে। চাদরের ভেতর ঢুকে পড়ে বাকি রাতটা পার করে দেয়া যায়। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি। গাছের তলায় ঘুমিয়েছি। ফুটপাথে ঘুমানো হয় নি।

বস্তা-ভাইয়ের পাশে শুয়ে পড়ার আগে কি তার অনুমতি নেয়ার দরকার আছে? ফুটপাতে যারা ঘুমোয় তাদের নিয়মকানুন কী? তাদেরও নিশ্চয়ই অলিখিত কিছু নিয়মকানুন আছে? ফুটপাতে অনেক পরিবার রাত কাটায়—স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের সোনার সংসার। সেইরকম কোনো পরিবারের পাশে নিশ্চয়ই উটকো ধরনের কেউ মাথার নিচে ইট বিছিয়ে শুয়ে পড়তে পারে না?

'বস্তা-ভাই। এই যে বস্তা ভাই!

'আবার কী হইছে?'

'আপনার পাশের ফাঁকা জায়গাটায় কি শুয়ে পড়তে পারি? যদি অনুমতি দেন।'

বস্তা-ভাই জবাব দিলেন না, তবে সরে গিয়ে খানিকটা জায়গা করলেন। এই প্রথম লক্ষ্য করলাম—বস্তা-ভাই একা ঘুমাচ্ছেন না, তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্রও আছে। তিনি পুত্রকেও নিজের দিকে টানলেন এবং কঠিন গলায় বললেন, বস্তা-ভাই বস্তা-ভাই করতেছেন কেন? ইয়ারকি মারেন? গরিবরে লইয়া ইয়ারকি করতে মজা লাগে?

না রে ভাই, ইয়ারকি করছি না। গরিব নিয়ে ইয়ারকি করব কী আমিও আপনাদের দলে। মুখ ভর্তি বমি। মুখ না ধুয়ে ঘুমুতে পারবনা। পানি কোথায় পাব বলে দিন। একটু দয়া করুন।

বস্তা ভাই দয়া করলেন। আঙুল উঁচিয়ে কি যেন দেখালেন। আমি এগিয়ে গেলাম। সম্ভবত কোন চায়ের দোকান। দোকানের পেছনে জালা ভর্তি পানি। মিনারেল ওয়াটারের একটা খালি বোতলও আছে। আমি পানি দিয়ে মুখ ধুলাম। দুই বোতলের মত পানি খেয়ে ফেললাম। এক বোতল পানি ঢেলে দিলাম গায়ে। ভয় নামক যে ব্যাপারটা শরীরে জড়িয়ে আছে—পানিতে তা ধুয়ে ফেলার একটা চেষ্টা। তারপর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। আমি তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। কোনো এক পর্যায়ে কেউ একজন সাবধানে আমার গায়ের চাদর তুলে নিয়ে চলে গেল। তাতেও আমার ঘুম ভাঙল না। সারারাত আমার গায়ে চাঁদের আলোর সঙ্গে পড়ল ঘন হিম। যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার গায়ে আকাশ-পাতাল জ্বর। নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছি না। দিনের আলোয় রাতের ভয়টা থাকার কথা না, কিন্তু লক্ষ্য করলাম

ভয়টা আছে। গুটিশুটি মেরে ছোট হয়ে আছে। তবে সে ছোট হয়ে থাকবে না। যেহেতু সে একটা আশ্রয় পেয়েছে সে বাড়তে থাকবে।

জ্বরে আমার শরীর কাঁপছে। চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। সবচে ভাল বুদ্ধি হাসপাতালে ভরতি হয়ে যাওয়া। হাসপাতালে ভরতির নিয়মকানুন কী? দরখাস্ত করতে হয়? নাকি রোগীকে উপস্থিত হয়ে বলতে হয়—আমি হাসপাতালে ভরতি হবার জন্যে এসেছি? আমার রোগ গুরুতর। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন। চিকিৎসার চেয়ে আমার যেটা বেশি দরকার তা হচ্ছে সেবা। ঘরে সেবা করার কেউ নেই। হাসপাতালের নার্সরা নিশ্চয়ই সেবাও করবেন। গভীর রাতে চার্জ লাইট হাতে নিয়ে বিছানায় বিছানায় যাবেন, রোগের প্রকোপ কেমন দেখবেন। স্যার, দয়া করে আমাকে ভরতি করিয়ে নিন।

হাসপাতালে ভরতি হওয়া যতটা জটিল হবে ভেবেছিলাম দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই তত জটিল না। একজনকে দেখলাম দুটাকা করে কী একটা টিকিট বিক্রি করছে। খুব কঠিন ধরনের চেহারা। সবাইকে ধমকাচ্ছে। তাকে বললাম, ভাই, আমার এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভরতি হওয়া দরকার। কী করতে হবে একটু দয়া করে বলে দিন।

সে বিস্মিত হয়ে বলল, হাসপাতালে ভরতি হবেন?

'জ্বি।'

'নিয়ে এসেছে কে আপনাকে?'

'কেউ নিয়ে আসেনি। আমি নিজে নিজেই চলে এসেছি। আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব।'

আপনার হয়েছে কী?

'ভূত দেখে ভয় পেয়েছি। ভয় থেকে জ্বর এসে গেছে।'

'ভূত দেখেছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'আমার কাছে এসেছেন কেন? আমি তো আউটডোর পেশেন্ট রেজিস্ট্রেশন স্লিপ দিই।'

'কার কাছে যাব তা তো স্যার জানি না।'

'আচ্ছা, আপনি বসুন ঐ টুলটায়।'

'টুলে বসতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আমি বরং মাটিতে বসি।'

'আচ্ছা বসুন।'

'থ্যাংকে য়্যু স্যার।'

'আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। যাদের স্যার বললে কাজ হবে তাদের বলবেন।'

'আপনাকে বলাতেও কাজ হয়েছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।'

'আমি ব্যবস্থা করব কী? আমি দুই পয়সার কেরানী। আমার কি সেই ক্ষমতা

আছে? যারা ব্যবস্থা করতে পারবেন তাদের কাছে নিয়ে যাব—এইটুকু।'

'স্যার, এইটুকুই বা কে করে?'

এই লোক আমাকে একজন তরুণী-ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। খুবই ধারালো চেহারা। কথাবার্তাও ধারালো। আমি এই তরুণীর কঠিন জেরার ভেতর পড়ে গেলাম।

'আপনার নাম কী।'

'ম্যাডাম, আমার নাম হিমু।'

'আপনার ব্যাপার কি?'

'ম্যাডাম আমি খুবই অসুস্থ। আমার এক্ষুনি হাসপাতালে ভরতি হওয়া দরকার। ভূত দেখে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পরেছি।'

'আপনি অসুস্থ। আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার—আপনি হাসপাতালে ভরতি হতে চান—খুব ভাল কথা। দরিদ্র দেশের সীমিত সুযোগ সুবিধার ভেতর যতটুকু করা যায়— আপনার জন্যে ততটুকু করা হবে। হাসপাতালে সীট নেই। আপনার কি ধারণা হোটেলের মতো আমরা বিছানা সাজিয়ে বসে আছি! আপনাদের জ্বর হবে, সর্দি হবে—আপনারা এসে বিছানায় শুয়ে পড়বেন। নার্সকে ডেকে বলবেন, কোলবালিশ দিয়ে যাও। এই আপনার ধারণা?'

'জ্বি না ম্যাডাম।'

'আপনি কি ভেবেছেন উদ্ভট একটা গল্প বললেই আমরা আপনাকে ভরতি করিয়ে নেব। ভূত দেখে জ্বর এসে গেছে? রসিকতা করার জায়গা পান না।'

ম্যাডাম, সত্যি দেখেছি। আপনি চাইলে আমি পুরো ঘটনা বলতে পারি।

'আমি আপনার ঘটনা শুনতে চাচ্ছি না।'

'ম্যাডাম, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন না?'

'আপনি দয়া করে কথা বাড়াবেন না।'

'শেকসপীয়ারের মতো মানুষও কিন্তু ভূত বিশ্বাস করতেন। তিনি হ্যামলেটে বলেছেন—There are many things in heaven and Earth. আমার ধারণা তিনি ভূত দেখেছেন। এদিকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন—?'

'স্টপ ইট।'

আমি 'স্টপ' করলাম।

তরুণী ডাক্তার আমাকে যে-লোকটি নিয়ে এসেছিল (নাম রশীদ) তার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। রশীদ বেচারা জোঁকের মুখে লবণ পড়ার মতো মিইয়ে গেল।

'রশীদ!'

'জ্বি আপা?'

'একে এখান থেকে নিয়ে যাও। ফালতু ঝামেলা আমার কাছে আর কখনো

আনবে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি আমি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে আছি। আমাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। তরুণী-ডাক্তার আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছেন। চোখ মেলতেই তিনি বললেন, হিমু সাহেব, এখন কেমন বোধ করছেন?

'ভাল।'

এইটুকু বলে আমি দ্বিতীয়বারের মত জ্ঞান হারালাম, কিংবা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

হাসপাতালের তৃতীয় দিনে আমাকে দেখতে এলেন মেজো ফুপা—বাদলের বাবা। তাঁর হাতে এক প্যাকেট আঙুর। একটা সময় ছিল যখন মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখতে যাবার সময় আঙুর নিয়ে যাওয়া হত। ফলের দোকানি আঙুর বিক্রির সময় মমতামাখা গলায় বলত—রুগির অবস্থা সিরিয়াস?

এখন আঙুর একশো টাকা কেজি—বরই বরং এই তুলনায় দামি ফল।

মেজো ফুপা আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, অবস্থা কী?

আমি জবাব দিলাম। কেউ রোগী দেখতে এসে যদি দেখে রোগী দিব্যি সুস্থ। পা নাচাতে নাচাতে হিন্দি গান গাইছে —তখন সে শকের মতো পায়। যদি দেখে রোগীর অবস্থা এখন-তখন, শ্বাস যায়-যায় অবস্থা তখন মনে শান্তি পায়— যাক, কষ্ট করে আসাটা বৃথা যায় নি। কাজেই ফুপার প্রশ্নে আমি চোখমুখ করুণ করে ফেললাম, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এরকম একটা ভাবও করলাম।

'জবাব দিচ্ছ না কেন? অবস্থা কী?'

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, ভাল। এখন একটু ভাল।

তোকে খুঁজে বের করতে খুবই যন্ত্রণা হয়েছে, কোন ওয়ার্ড, বেড নাম্বার কী কেউ জানে না।

'ও আচ্ছা।'

'একবার তো ভেবেছি ফিরেই চলে যাই। নেহায়েত আঙুর কিনেছি বলে যাই নি। আঙুর খেতে নিষেধ নেই তো?'

'জ্বি না।'

'নে, আঙুর খা।'

আমি টপাটপ আঙুর মুখে ফেলছি আর ভাবছি—ব্যাপারটা কী? আমি যে হাসপাতালে, এই খোঁজ ফুপা পেলেন কোথায়? কাউকেই তো জানানো হয় নি। আমি বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না যে খবরের কাগজে নিউজ চলে গেছে—

হিমুর সর্দিজ্বর

জনদরদি দেশনেতা প্রাণপ্রিয় হিমু সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে যান। কিছুক্ষণ তাঁর শয্যাপার্শ্বে থেকে তাঁর আশু আরোগ্য কামনা করেন। মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্যও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বনমন্ত্রী, তেল ও জ্বালানি মন্ত্রী, ত্রাণ উপমন্ত্রী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন—হিমু সাহেবের শারীরিক অবস্থা এখন ভাল। হিমু সাহেবের ভক্তবৃন্দের চাপে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁরা যেন হিমু সাহেবকে বিরক্ত না করেন। হিমু সাহেবের দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বুলেটিন প্রতিদিন দুপুর বারোটায় প্রকাশ করা হবে।

আমি যে হাসপাতালে এই খবর তো আমার কাঁধের দুই ফেরেশতা ছাড়া আর কারোরই জানার কথা না! ধরা যাক খবরটা সবাই জানে, তার পরেও ফুপা হাসপাতালে চলে আসবেন এটা হয় না। এত মমতা আমার জন্যে বাদল ছাড়া আর কারোরই নেই। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কী?

'ফুপা আমি যে হাসপাতালে এটা জানলেন কীভাবে? পেপারে নিউজ হয়েছে?'

'পেপারে নিউজ হবে কেন? তুই কে? হাসপাতাল থেকে আমাকে টেলিফোন করেছে।'

'তোমার নাম্বার ওরা পেল কোথায়?'

'তুই দিয়েছিস।'

আমার মনে পড়ল কোনো এক সময় হাসপাতালে ভরতির ফরম তরুণী-ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেই ফিলআপ করেছেন এবং আগ বাড়িয়ে অসুখের খবর দিয়েছেন।

'খুব মিষ্টি গলার একজন মেয়ে, ডাক্তার আপনাকে খবর দিয়েছে, তাই না?'

'হুঁ। তোর সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিল।'

'কী জানতে চাচ্ছিল?'

'তুই কী করিস না-করিস এইসব। তোর হলুদ পাঞ্জাবি, উদ্ভট কথাবার্তা শুনে ভড়কে গেছে আর কি! তুই আর কিছু পারিস বা না পারিস মানুষকে ভড়কাতে পারিস।'

'ডাক্তাররা এত সহজে ভড়কায় না। তারপর বলুন ফুপা আমার কাছে কেন এসেছেন।'

'তোকে দেখতে এসেছি আর কি।'

'আমাকে দেখতে হাসপাতালে চলে আসবেন এটা বিশ্বাসযোগ্য না। ঘটনা কী?'

বাদলের ব্যাপারে তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল।

ফুপা ইতস্তত: করে বললেন,

আমি শান্ত গলায় বললাম, বাদলকে নিয়ে তো আপনার এখন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সে কানাডায়। আমার প্রভাববলয় থেকে অনেক দূরে। আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কোনো দায়িত্বও আপনাকে পালন করতে হচ্ছে না। নাকি সে কানাডাতেও খালি পায়ে হাঁটা শুরু করেছে?'

ফুপা চাপা গলায় বললেন, বাদল এখন ঢাকায়।

'ও আচ্ছা।'

'মাসখানিক থাকবে। তোর কাছে আমার অনুরোধ এই এক মাস তুই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবি। ওর সঙ্গে দেখা করবি না।'

'গা ঢাকা দিয়েই তো আছি। হাসপাতালে লুকিয়ে আছি।'

'হাসপাতালে তো আর এক মাস থাকবি না, তোকে নাকি আজকালের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

'আমাকে বাদলের কাছ থেকে একশো হাত দূরে থাকতে হবে তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'নো প্রবলেম।'

'শোন হিমু, আমরা চাচ্ছি ওর একটা বিয়ে দিতে। মোটামুটি নিমরাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন তুই যদি ভুজং ভাজং দিস তাহলেতো আর বিয়ে হবে না। সে হলুদ পাঞ্জাবী পরে হাঁটা দেবে।

'আমি কেন ভুজং ভাজং দেব?'

'তোকে দিতে হবে না। তোকে দেখলেই ওর মধ্যে আপনা-আপনি ভুজং ভাজং হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে তাকে নরম্যাল করেছি, সব জলে যাবে।'

আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।'

'কথা দিচ্ছিস?'

'হুঁ।'

'বাদল এয়ারপোর্টে নেমেই বলেছে— হিমুদা কোথায়? আমি মিথ্যা করে বলেছি, সে কোথায় কেউ জানে না।'

'ভাল বলেছেন।'

'মেসের ঠিকানা চাচ্ছিল—তোর আগের মেসের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।'

'খুবই ভাল করেছেন আগের ঠিকানায় খোঁজ নিতে গিয়ে ঠগ খাবে।'

'খোঁজ নিতে এর মধ্যেই গিয়েছে। ছেলেটাকে নিয়ে কি যে দুশ্চিন্তায় আছি! বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। চিন্তা-ভাবনা যা করার বৌমা করবে।'

'বিয়ে ঠিকঠাক করে ফেলেছেন?'

'কয়েকটা মেয়ে দেখা হয়েছে—এর মধ্যে একটাকে তোর ফুপুর পছন্দ হয়েছে। মেয়ের নাম হল—চোখ।'

' মেয়ের নাম চোখ?'

'হ্যাঁ চোখ। আজকালকি নামের কোন ঠিক ঠিকানা আছে। যার যা ইচ্ছা নাম রাখছে।'

'চোখ নাম হবে কীভাবে! আঁখি না তো?'

'ও হ্যাঁ, আঁখি। সুন্দর মেয়ে— ফড়ফড়ানি টাইপ। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তিনটা কথা বলে। বাদলের সঙ্গে মানাবে। একজন কথা বলে যাবে, একজন শুনে যাবে।'

'মেয়ে তোমার পছন্দ না?'

'তোর ফুপুর পছন্দ। পুরুষমানুষের কি সংসারে কোনো say থাকে। থাকে না। পুরুষরা পেপার হেড হিসেবে অবস্থান করে। নামে কর্তা, আসলে ভর্তা। তুই বিয়ে না করে খুব ভাল আছিস। দিব্যি শরীরে বাতাস লাগিয়ে ঘুরছিস। তোকে দেখে হিংসা হয়। স্বাধীনতা কী জিনিস তার কী মর্ম সেটা বোঝে শুধ বিবাহিত পুরুষরাই। উঠিরে হিমু।'

'আচ্ছা।'

'বাদলের প্রসঙ্গে যা বলেছি মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে।'

'ও আচ্ছা তোর অসুখের ব্যাপারটাই তো কিছু জানলাম না। কী অসুখ?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে।"

'ঠাণ্ডা লাগল কীভাবে?'

'ফুটপাতে চাদর গায়ে শুয়েছিলাম। চোর চাদর নিয়ে গেল।'

'ফুটপাতে ঘুমুচ্ছিলি?'

'জ্বি।'

'ঘরে ঘুমুতে আর ভাল লাগে না?'

'তা না—'

'শোন হিমু, বাদলের কাছ থেকে দূরে থাকবি। মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে।'

'টাকাপয়সা কিছু লাগবে? লাগলে বল, লজ্জা করিস না। ধর, পাঁচশো টাকা রেখে দে। অষুধপত্র কেনার ব্যাপার থাকতে পারে।'

আমি নোটটা রাখলাম। ফুপা চিন্তিত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেলেন। ছেলে আমার ফাঁদে পড়ে যদি আবার ফুটপাতে শয্যা পাতে! কিছুই বলা যায় না।

হাসপাতাল আমার বেশ পছন্দ হল। হাসপাতালের মানুষগুলির ভেতর একটা মিল আছে। সবাই রোগী। রোগযন্ত্রণায় কাতর। ব্যাধি সব মানুষকে এক করে দিয়েছে। একজন সুস্থ মানুষ অপরিচিত একজন সুস্থ মানুষের জন্যে কোনো সহমর্মিতা বোধ করবে না, কিন্তু একজন অসুস্থ মানুষ অন্য একজন অসুস্থ মানুষের জন্যে করবে।

হাসপাতালে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে না। সকালে নাশতা আসছে। দু'বেলা খাবার আসছে। দুনম্বরি ব্যবস্থাও আছে। জায়গামতো টাকা খাওয়ালে স্পেশাল ডায়েটের ব্যবস্থা হয়। ডাক্তারদের অনেক সংস্থা টংস্থা আছে। করুণ গলায় তরুণ ডাক্তারদের কাছে অভাবের কথা বলতে পারলে ফ্রী অষুধ তো পাওয়া যায়ই, পথ্য কেনার টাকাও পাওয়া যায়।

রোগ সেরে গেছে, তার পরেও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে শরীর সারাবার ব্যবস্থাও আছে। খাতাপত্রে নাম থাকবে না—কিন্তু বেড থাকবে। এক-একদিন এক-এক ওয়ার্ডে গিয়ে ঘুমুতে হবে।

ছেলেমেয়ে নিয়ে গত সাত মাস ধরে হাসপাতালে বাস করছে এমন একজনের সন্ধানও পাওয়া গেল। নাম ইসমাইল মিয়া। স্ত্রীর ক্যানসার হয়েছিল তাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়ে মাসখানিক চিকিৎসা করাল। সেই থেকে ইসমাইল মিয়ার হাসপাতালের সঙ্গে পরিচয়। ধীরে ধীরে পুরো পরিবার নিয়ে সে হাসপাতালে পার হয়ে গেল। স্ত্রী মরে গেছে। তাতে অসুবিধা হয় নি। বাচ্চারা হাসপাতালের বারান্দায় খেলে। এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে ঘুরে। কেউ কিছু বলে না। ইসমাইল মিয়া দিনে বাইরে কাজ-কর্ম করে (মনে হয় দু'নম্বরী কাজ। চুরি, ফটকাবাজি) রাতে হাসপাতালে এসে ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করে। ঘুমানোর একটা ব্যবস্থা করে।

ইসমাইল মিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল। অতি ভদ্র। অতি বিনয়ী। হাসিমুখ ছাড়া কথা বলে না। তার মধ্যে দার্শনিক ব্যাপারও আছে। আমি বললাম, হাসপাতালে আর কতদিন থাকবে?

ইসমাইল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, ক্যামনে বলি ভাইজান? আমার হাতে তো কিছু নাই।

'তোমার হাতে নেই কেন?'

'সব তো ভাইজান আল্লাহ্‌পাকের নির্ধারণ। আল্লাহ্‌পাক নির্ধারণ করে রেখেছে আমি বালবাচ্চা নিয়া হাসপাতালে থাকব—এইজন্যে আছি। যেদিন নির্ধারণ করবেন আর দরকার নাই— সেইদিন বিদায়।'

'তাতো বটেই।'

'আল্লাহ্‌পাকের হুকুম ছাড়াতো ভাইজান কিছুই হওনের উপায় নাই।'

'তাও ঠিক।'

'সামান্য যে পিপিলিকা আল্লাহ্‌পাক তারও খবর রাখেন। আপনার পায়ের

তলায় পইরা দুইটা পিপিলিকার মৃত্যু হবে তাও আল্লাহ্‌পাকের বিধান। আজরাইল আলাইহেস সালাম আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে দুই পিপিলিকার জান কবজ করবে।'

'ও আচ্ছা।'

'এই জন্যেই ভাইজান কোন কিছু নিয়া চিন্তা করি না। যার চিন্তা করার কথা সেই চিন্তা করতেছে। আমি চিন্তা কইরা কি করব।'

'কার চিন্তা করার কথা?'

'কার আবার আল্লাহ্‌পাকের।'

ইসমাইল মিয়া খুবই আল্লাহ্‌ভক্ত। সমস্যা হচ্ছে তার প্রধান কাজ— চুরি। চুরির পক্ষেও সে ভাল যুক্তি দাঁড় করিয়েছে—

'চুরিতে আসলে কোন দোষ নাই ভাইজান। ভালুক কি করে? পেটে ক্ষিধা লাগলে মৌমাছির মৌচাক থাইক্যা মধু চুরি করে। এর জন্যে ভালুকের দোষ হয় না। এখন বলেন মানুষের দোষ হইব ক্যান।'

বগার মা নামের এক বৃদ্ধার সঙ্গেও পরিচয় হল। সে ঝাড়ফুক করে। ঝাড়ু র কাঠি নিয়ে রোগিদের ঝাড়ে। তাতে নাকি অতি দ্রুত রোগ আরোগ্য হয়। হাসপাতালে সর্বাধুনিক চিকিৎসার সাথে সাথে চলে ঝাড়ফুক।

এই বৃদ্ধা দশটাকার বিনিময়ে আমাকেও একদিন ঝেড়ে গেলেন। আমি দশটাকার বাইরে আরো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঝাড়া মন্ত্র খানিকটা শিখে নিলাম।

"ও কালী সাধনা
বিষ্টু কালী মাতা।
উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম।
রাও নাও — ঈশানে যাও
. . . ."

বগার মা'র সঙ্গে অনেক গল্পগুজবও করলাম। জানা গেল বগা বলে তাঁর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। তাঁর তিনবার বিয়ে হয়েছিল। কোন ঘরেই কোন সন্তান হয় নাই। কি করে তাঁর নাম বগার মা হয়ে গেল তিনি নিজেও জানেন না।

আমি বললাম, মা ঝাড় ফুকে রোগ সারে?

বগার মা অতি চমৎকৃত হয়ে বললেন, কি কও বাবা? ঠিকমত ঝাড়তে পারলে ক্যানসার সারে।

'আপনি সারিয়েছেন?'

'অবশ্যই— ত্রিশ বচ্ছর ধইরা ঝাড়তেছি। ত্রিশ বচ্ছরে ক্যানসার ম্যানসার কত কিছু ভাল করেছি। একটা কচকা ঝাড়া দশটা "পেনিসিলি" ইনজেকশনের সমান। বাপধন তোমারে যে ঝাড়া দিলাম এই ঝাড়ায় দেখবা আইজ দিনে দিনে সিধা হইয়া দাঁড়াইবা।'

হাসপাতালে আমি অনেক কিছুই শিখলাম। হাসপাতালে ব্যাপারটা সম্ভবত আমার বাবার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। নয়ত তিনি অবশ্যই তাঁর পুত্রকে কিছুদিন হাসপাতালে রেখে দিতেন। এবং তাঁর বিখ্যাত উপদেশমালার সঙ্গে আরো একটি উপদেশ যুক্ত হত—

"প্রতি দুই বৎসর অন্তর হাসপাতালে সাতদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। মানুষের জরা-ব্যধি ও শোক তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিবে। ব্যধি কী, জীব জগৎকে ব্যাধি কেন বার বার আক্রমণ করে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে মনে রাখিও ব্যাধিকে ঘৃণা করিবে না। ব্যাধি জীবনেরই অংশ। জীবন আছে বলিয়াই ব্যাধি আছে।"

'কেমন আছেন হিমু সাহেব?

'জ্বি ম্যাডাম ভাল আছি।'

'আপনার বুকে কনজেশন এখনো আছে। এন্টিবায়োটিক যা দেয়া হয়েছে— কনটিনিউ করবেন। সেরে যাবে।'

'থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।'

'আপনাকে রিলিজ করে দেয়া হয়েছে আপনি চলে যেতে পারেন।'

'থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।'

'প্রতিটি বাক্যে একবার করে ম্যাডাম বলছেন কেন? ম্যাডাম শব্দটা আমার পছন্দ না। আর বলবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা বলব না।'

'আপনার হাতে কি সময় আছে? সময় থাকলে আমার চেম্বারে আসুন। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

আমি তরুণী ডাক্তারের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তাঁর নাম ফারজানা। সুন্দর মানুষকেও সব সময় সুন্দর লাগে না। কখনো খুব সুন্দর লাগে, কখনো মোটামুটি লাগে। এই তরুণীকে আমি যতবার দেখেছি ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। এপ্রন ফেলে দিয়ে ফারজানা যদি ঝলমলে একটা শাড়ি পরত তাহলে কি হত? ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, কপালে টিপ। হালকা নীল একটা শাড়ি— কানে ঝুলবে নীল পাথরের ছোট্ট দুল। এই মেয়ে কি বিয়ে বাড়িতে সেজেগুজে যায় না? তখন চারদিকে অবস্থাটা কি হয়? বিয়ের কনে নিশ্চয়ই মন খারাপ করে ভাবে— এই মেয়েটা কেন এসেছে। আজকের দিনে আমাকে সবচে সুন্দর দেখানোর কথা। এই মেয়েটা সেই জায়গা নিয়ে নিয়েছে। এটা সে পারে না।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'বসুন।'

আমি বসলাম। আমার সামনে পিরিচে ঢাকা একটা চায়ের কাপ। ফারজানার সামনেও তাই। চা তৈরী করে সে আমাকে নিয়ে এসেছে। আমি তার ভেতরে সামান্য হলেও কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরেছি।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনি কি সিগারেট খান?'

'কেউ দিলে খাই।'

'নিন সিগারেট নিন। ডাক্তাররা সব রোগীদের প্রথম যে উপদেশ দেয় তা হচ্ছে– সিগারেট ছাড় ন। সেখানে আমি আপনাকে সিগারেট দিচ্ছি– কারণ কি বলুনতো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কারণ আমি নিজে একটা সিগারেট খাব। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সিগারেট ধরেছিলাম। ছেলেরা সিগারেট খাবে আমরা মেয়েরা কেন খাব না? এখন এমন অভ্যাস হয়েছে। এর থেকে বেরুতে পারছি না। চেষ্টাও অবশ্যি করছি না।'

ফারজানা সিগারেট ধরাল। আশ্চর্য- সিগারেটটাও তার ঠোঁটে মানিয়ে গেল। পাতলা ঠোঁটের কাছে জ্বলন্ত আগুন। বাহ্ কি সুন্দর। সুন্দরী তরুণীদের ঘিরে যা থাকে সবইকি সুন্দর হয়ে যায়?

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'এখন গল্প করুন। আপনার গল্পগুনি।'

'কি গল্প শুনতে চান?'

'আপনি অস্বাভাবিক একটা দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছিলেন। ভয় পেয়ে অসুখ বাধিয়েছেন। সেই অস্বাভাবিক দৃশ্যটা কি আমি জানতে চাচ্ছি।'

'কেন জানতে চাচ্ছেন?'

'জানতে চাচ্ছি— কারণ এই পৃথিবীতে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে না। পৃথিবী চলে তার স্বাভাবিক নিয়মে। মানুষ সেইসব নিয়ম একে একে জানতে শুরু করেছে— এই সময় আপনি যদি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখতে শুরু করেন তাহলেতো সমস্যা।'

'মানুষ কি সবকিছু জেনে ফেলেছে?'

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সব কিছু না জানলেও অনেক কিছুই জেনেছে। ইউনিভার্স কি ভাবে সৃষ্টি হল তাও জেনে গেছে।

আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাসিমুখে বললাম, ইউনিভার্স কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

'বিগ ব্যাং থেকে সব কিছুর শুরু। আদিতে ছিল প্রিমরডিয়েল এটম যার দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা কিছুই নেই। সেই এটম বিগ ব্যাং এ ভেঙ্গে গেল– তৈরী হল স্পেস এবং টাইম। সেই স্পেস ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক্সপানডিং ইউনিভার্স।'

'সময়ের শুরু তাহলে বিগ ব্যাং থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'বিগ ব্যাং এর আগে সময় ছিল না?'

'না।'

'বিগ ব্যাং এর আগে তাহলে কি ছিল?'

'সেটা মানুষ কখনো জানতে পারবে না। মানুষের সমস্ত বিদ্যা এবং জ্ঞানের শুরুও বিগ ব্যাং এর পর থেকেই।'

'তাহলেতো বলা যেতে পারে— জ্ঞানের একটা বড় অংশই মানুষের আড়ালে রেখে দেয়া হয়েছে।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছেন?'

'না সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না। তারা যা বলে তাই হাসিমুখে মেনে নেই।'

'সস্তা ধরনের কনভারসেশন আমার সঙ্গে দয়া করে করবেন না। "সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না" এটা বহু পুরাতন ডায়ালগ। বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। শুনলেই গা জ্বালা করে। আপনি খুব অল্প কথায় আমাকে বলুন— কি দেখে ভয় পেয়েছিলেন, তারপর রিলিজ অর্ডার নিয়ে বাসায় চলে যান।'

'আমি আপনাকে বলব না।'

ফারজানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। তার ঠোঁটের সিগারেট নিভে গিয়েছিল— সে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কেন বলবেন না?

আমি শান্তগলায় বললাম, আপনাকে আমি বলে ব্যাপারটা বুঝাতে পারব না। আপনাকে দৃশ্যটা দেখাতে হবে। ঘটনাটা কি পরিমাণে অস্বাভাবিক তা জানার জন্যে আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। আমি বরং আপনাকে দেখাবার ব্যবস্থা করি।

'আপনি আমাকে ভূত দেখাবেন?'

'ভূত কিনা তাতো জানি না— যে জিনিসটা দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা দেখাব।'

'কবে?'

'কবে তা বলতে পারছি না। কোন একদিন এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আচ্ছা বেশ নিয়ে যাবেন। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

আমি গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

ঢাকা শহরের অন্যসব গলির মতই একটা গলি। একপাশে নোংরা নর্দমা। নর্দমায় গলা পিচের মত ঘন-কাল ময়লা পানি। গলিতে ডাষ্টবিন বসানো হয় না বলে দু'পাশের বাড়ির ময়লা গলিতেই ফেলা হয়। সেই ময়লার বেশিরভাগ লোকের পায়ে পায়ে চলে যায়। আর বাকিটা জমে থেকে থেকে এক সময় গলিরই অংশ হয়ে যায়।

চারটা কুকুর থাকার কথা— এদের দেখলাম না। সেই জায়গায় ছোট ছোট কিছু বাচ্চাকে দেখলাম টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছে। খেলা আপাততঃ বন্ধ কারণ বল নর্দমায় ডুবে গেছে। কাঠি দিয়ে বল খোঁজা হচ্ছে। ঘন ময়লা পানির নর্দমায় টেনিস বলের ডুবে যাবার কথা না— আর্কিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী ভেসে থাকার কথা। ডুবে গেল কেন কে জানে।

আমি গলির শেষ মাথা পর্যন্ত যাব কি যাব না ঠিক করতে পারছি না। এখন এই দিনের আলোয় শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া না যাওয়া অর্থহীন— মধ্যরাতের পরেই কোন এক সময় আসতে হবে। আজ বরং কিছুক্ষণ বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা দেখে ফিরে আসা যাক। সাতদিন হাসপাতালে শুয়ে থেকে শরীর অন্যরকম হয়ে গেছে। শরীর ঠিক করতে হবে। হিমু টাইপ জীবন চর্চা শুরু করা দরকার।

বাচ্চারা বল খুঁজে পেয়েছে। নর্দমা থেকে বল তুলতে গিয়ে ছ'টা বাচ্চা নোংরায় মাখামাখি হয়েছে। তাতে তাদের কোন বিকার নেই। বল খুঁজে পাওয়ার আনন্দেই তারা অভিভূত। তারা তাদের খেলা শুরু করল।

আমি শুরু করলাম আমার খেলা— ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় হাঁটা। গত সাতদিন এদের কাউকে দেখিনি। রাস্তাগুলির জন্যে আমার মন কেমন করছে। রাস্তাদেরও হয়ত আমার জন্যে মন কেমন করছে। কথা বলার ক্ষমতা থাকলে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় জীবনানন্দের মত বলত— হিম সাহেব এত দিন.কোথায় ছিলেন?

সন্ধ্যার দিকে আমি কাকরাইলের কাছাকাছি চলে এলাম। আমার পদযাত্রা কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত হল— কারণ আমার পায়ের কাছে একটা মানিব্যাগ। পেট ফুলে মোটা হয়ে আছে। আমার কাছে মনে হল মানিব্যাগটা চিৎকার করে বলছে— এই গাধা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমাকে তুলে পকেটে

লুকিয়ে ফেল। কেউ দেখছে না।

কালো পিচের রাস্তায় কালো রঙের মানিব্যাগ, চট করে চোখে পড়ে না। তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্ধকারে লোকজন মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে না, সোজাসুজি তাকিয়ে হাঁটে। এইজন্যেই কী কারও চোখে পড়ে নি? তার পরেও পেটমোটা একটা মানিব্যাগ রাস্তায় পড়ে থাকবে আর তা কারও চোখে পড়বে না এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না। আমি সাতদিন রাস্তায় ছিলাম না। এই সাতদিনে বাংলাদেশের রাজপথগুলিতে কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড-কারখানা ঘটতে শুরু করেছে?

আমি হাত বাড়িয়ে মানিব্যাগ তুললাম। অতিরিক্ত পেটমোটা মানিব্যাগে সাধারণত মালপানি থাকে না, কাগজপত্রে ঠাসা থাকে। এখানেও হয়তো তা-ই। তুলে ঠক খাব। আমার আগে অনেকেই এই ব্যাগ তুলে ঠক খেয়ে আবার ফেলে দিয়েছে। এমনও হতে পারে সে ঘাপটি মেরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে মজা দেখার জন্যে।

ব্যাগ খুললাম। গুপ্তধন পাওয়ার মতো আনন্দ হল। ব্যাগভরতি টাকা। রাবারের রিবন দিয়ে বাঁধা পাঁচশো টাকার নোটের স্তূপ। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার তো হবেই, বেশিও হতে পারে। ব্যাগটা ঝট করে পাঞ্জাবির পকেটে লুকিয়ে ফেলতে যাব তখন মনে হল আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুদের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। হিমুরা অন্যের মানিব্যাগ এমন ঝট করে লুকিয়েও ফেলতে চায় না। এখন কী করব? ব্যাগটা যেখানে ছিল সেখানে ফেলে রাখব? অসম্ভব! রাস্তায় পড়ে থাকা দশটাকার একটা নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু পাঁচশো টাকার নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। নোটটা চুম্বক হয়ে মানবসন্তানদের আকর্ষণ করতে থাকে। অতি বড় যে সাধু তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে একটা ছিঁচকে চোর।

ব্রাদার, আপনার হাতে এটা কী মানিব্যাগ?

আমি পাশ ফিরলাম। ছুঁচালো চেহারার এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ না ধুলে চেহারায় যেমন অসুস্থ ভাব লেগে থাকে তার মুখে সেই অসুস্থ ভাব। চোখ হলুদ। ঠোঁট কালচে মেরে আছে। নিচের ঠোঁট খানিকটা ঝুলে গেছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যায়। তবে কাপড়চোপড় বেশ পরিপাটি। শুধু জুতাজোড়া ময়লা। অনেক দিন কালি করা হয় নি, রঙ চটে গেছে। একটু দূরে আরো একজন। তার চেহারাও ছুঁচালো। তার মুখেও অসুস্থ ভাব এবং চোখ হলুদ। কোনো ডাক্তার দেখলে দুজনকেই বিলিরুবিন টেস্ট করতে পাঠাত। আমি এই জাতীয় যুবকদের চিনি। সামান্য চুরি থেকে শুরু করে মানুষের পেটে দশ ইঞ্চি ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দেয়ার মতো অপরাধ এরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করতে পারে। এরা কখনো একা চলাফেরা করে না। আবার এদের দল বড়ও হয় না। দুজনের ছোট ছোট দল। দুজনের একজন (সাধারণত দুবলা-পাতলাজন) ওস্তাদ, তিনি হুকুম দেন। অন্যজন সেই হুকুম পালন করে।

এই দলটার যিনি ওস্তাদ তিনি আবার কথা বললেন, কী ব্রাদার, কথা বলছেন না কেন? হাতে কী মানিব্যাগ?

আমি হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে বললাম, তাই তো মনে হয়।

'কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

'কুড়িয়ে পাব কীভাবে? মানিব্যাগ তো আর ফুল না যে পড়ে থাকবে আর কুড়িয়ে নেব।'

'পেয়েছেন কোথায়?'

'ছিনতাই করেছি।'

দ্বিতীয় ছুঁচালো যুবক এবার হালকা চালে এগিয়ে আসছে। এ বেশ বলশালী হলেও হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার মুখভরতি পান। সে ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে পানের পিক ফেলে অবহেলার ভঙ্গিতে বলল–কী হইছে? প্রশ্নটা সে আমাকেই করল। তার পরেও আমি বিস্মিত হবার মতো করে বললাম, আমাকে বলছেন?

'জ্বে আপনারে, প্রবলেমটা কী?'

'কোনো প্রবলেম নেই। আমার হাতে একটা মানিব্যাগ আছে এটাই প্রবলেম। মানিব্যাগ ভরতি পাঁচশো টাকার নোট। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হবার কথা। দেখবেন? এই যে নিন দেখুন।

তারা মুখ-চাওয়া চাওয়ি করল। দেখতে চাইল না। তার পরেও আমি ব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখিয়ে দিলাম। তারা আবারও মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করল। আমার ব্যবহারে তারা মনে হল খানিকটা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। আমি মিষ্টি করে হাসলাম। তাদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়ে মধুর গলায় বললাম, মানিব্যাগ নিতে চান?

কাক মানুষের হাত থেকে খাবার নিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে যদি যত্ন করে থালায় খাবার বেড়ে ডাকা হয় 'আয় আয়' তখন তারা আর কাছে আসে না। দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। উড়ে চলেও যায় না, আবার কাছেও আসে না। যুবক দুটির মধ্যে কাকভাব প্রবল বলে মনে হল। তারা সরু চোখে মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে। হাত বাড়াচ্ছে না। আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না। আমি আবারও বললাম, কী মানিব্যাগ নিতে চান? নিতে চাইলে নেন।

পানমুখের যুবক আবারও পিক ফেলল। সে একটু চিন্তিতমুখে তার ওস্তাদের দিকে তাকাচ্ছে। ওস্তাদের নির্দেশের অপেক্ষা। ওস্তাদ নির্দেশ দিচ্ছেন না। সময় নিচ্ছেন। পরিস্থিতি তিনি যত সহজ ভেবেছিলেন এখন তত সহজ মনে হচ্ছে না। চট করে ডিসিশান নেয়া যাচ্ছে না।

জায়গাটা নির্জন নয়। ঢাকা শহরে নির্জন জায়গা নেই। তবে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সে-জায়গাটায় এই মুহূর্তে লোক-চলাচল নেই। ওস্তাদ এবং শাগরেদ আমার দু-পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওস্তাদের বাঁ হাত তার প্যান্টের পকেটে।

লোকটি সম্ভবত বায়া। এবং সে তার বাঁ হাতে ক্ষুর ধরে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে ক্ষুর বের করবে। সেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা।

আমি হঠাৎ করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা শুরু করলাম। তারা একটু হকচকিয়ে গেল, তবে তৎক্ষণাৎ আমার পেছনে পেছনে আসতে শুরু করল। ওস্তাদ বিশেষ ভঙ্গিতে কাশলেন, সঙ্গে সঙ্গে শাগরেদ প্রায় দৌড়ে আমার সামনে চলে এল। এখন আমরা তিনজন হাঁটছি। শাগরেদ সবার আগে, মাঝখানে আমি এবং পেছনে ওস্তাদ। ওরা আমার হাত থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে দৌড় দিচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না। সবচে সহজ এবং যুক্তিযুক্ত কাজ হল মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দেয়া। অবশ্যি এদের নানান রকম টেকনিক আছে। এরা কোন টেকনিক ফলো করছে কে জানে।

কাকরাইলের আশেপাশের রাস্তার একটা নিয়ম হল কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদল তবলিগ জামাতি কোত্থেকে যেন উদয় হয়। এখানেও তা-ই হল। দশ-এগারো জনের একটা দল পোটলা-পুটলি, বদনা, ছাতা নিয়ে উপস্থিত। হাসি-খুশি কাফেলা। তারা চলছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। আমি মাথা ঘুরিয়ে আমার পেছনের ওস্তাদের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখ হতাশায় মিইয়ে গেছে। নিচের ঠোঁট আরও নেমে গেছে। ভাল একটা শিকার পেয়েছিল। সেই শিকার হাসিমুখে তবলিগ জামাতীদের দলে ভিড়ে গেছে।

তবলিগের দল কাকরাইল মসজিদের দিকে চলে গেল। আমি ইচ্ছা করলে ওদের সঙ্গে ভীড়ে যেতে পারতাম। তা করলাম না। আমি রওনা হলাম চায়ের দোকানের দিকে। ওস্তাদ এবং শাগরেদের মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। তারা চোখে-চোখে কিছু কথা বলল। দুজনই একসঙ্গে সিগারেট ধরাল। তারাও আসছে। আসুক। চা-টা একসঙ্গে খাই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মজাদার নাটকের ভেতর ঢুকে গেছি। ভাল লাগছে। নাটকের শেষটা রক্তারক্তি পর্যন্ত না গড়ালেই হয়।

চায়ের দোকানের মালিকের নাম কাওছার মিয়া। এক মধ্যরাতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কাওছার মিয়ার ধারণা সেই রাতে আমি তাকে ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। মধ্যরাতের পরিচিতজনরা সাধারণত সন্ধ্যারাতে কেউ কাউকে চেনে না। কাওছার মিয়া চিনল। "আরে হিমু ভাইয়া, আফনে!" এই বলে যে-চিৎকার দিল তাতে নামাজ ভঙ্গ করে কাকরাইল মসজিদের মুসুল্লিদের ছুটে আসার কথা। তাঁরা ছুটে এলেন না, তবে ওস্তাদ ও শাগরেদের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। কাওছার মিয়া চায়ের দোকানের মালিক হলেও তাকে দেখাচ্ছে ভীমভবানীর মতো। সে আদর করে কারো পিঠে থাবা দিলে সেই মানব সন্তানের মেরুদণ্ডের বেশ কিছু হাড় খুলে পড়ে যাবার কথা।

কাওছার মিয়া চিৎকার দিয়েই থামল না, দোকান ফেলে ছুটে এসে পায়ে পড়ে গেল। যেন অনেকদিন পর শিষ্য তার গুরুর দেখা পেয়েছে। চরণধুলি না

নেয়া পর্যন্ত শিষ্য-গুরুর সাক্ষাত সম্পূর্ণ হবে না।

'আফনেরে যে আবার দেখমু ভাবি নাই। আল্লাহ্‌পাকের খাস রহমতে আফনেরে পাইছি। আছেন কেমুন হিমু ভাই?'

'ভাল।'

'আফনে একটা বড়ই আচায্য মানুষ। অখন কন কেমনে আফনের খেদমত করি।'

'চা খাওয়াও। পয়সা কিন্তু দিতে পারব না।'

কাওছার হতভম্ব গলায় বলল, পয়সার কথা তুললেন? এর থাইক্যা জুতা দিয়া দুই গালে দুইটা বাড়ি দিতেন।

আমি ওস্তাদ ও শাগরেদকে দেখিয়ে বললাম, আমার দুজন গেস্ট আছে। এদেরও চা দাও।

কাওছার মিয়া তার সবকটা দাঁত বের করে বলল, আর কী খাইবেন কন।

'আর কিছু লাগবে না।'

'ছিরগেট? ছিরগেট আইন্যা দেই?'

'দাও।'

কাওছার মিয়া দোকানের ছেলেটাকে পান-সিগারেট আনতে পাঠাল। তিনশলা বেনসন। তিনটা মিষ্টি পান, জরদা "আলিদা"।

ওস্তাদ ও শাগরেদ পুরোপুরি থমকে গেল। তবে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। এখন তাদের চোখ আমার হাতে-ধরা মানিব্যাগের দিকে। আমি চায়ের কাপ তাদের দিকে বাড়িয়ে বললাম, ভাই, চা খান। অনেকক্ষণ আমার পিছনে পিছনে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই টায়ার্ড।

ওস্তাদ বললেন, চা খাব না।

শাগরেদও সঙ্গে সঙ্গে বলল, চা খাব না।

কাওছার মিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, হিমু ভাইয়া চা সাধতেছে, আর চা খাইবেন না! কন কী আফনে? আচায্য ঘটনা। ধরেন চা নেন।

ওস্তাদ ও শাগরেদ দুজনেই শুকনো মুখে চায়ের কাপ তুলল। কাওছার মিয়া তার বেনসন সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আফনাদের পরিচয়?

ওস্তাদ ও শাগরেদ মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমি তাদের পরিচয়দান থেকে রক্ষা করলাম। কাওছারকে বললাম, শোনো কাওছার মিয়া। আমি একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি। মানিব্যাগে টাকার পরিমাণ ভালই, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার তো বটেই! টাকাটা দিয়ে কী করা যায় বলো তো!

কাওছারের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, খাইছে রে! আমি ওস্তাদ ও শাগরেদের দিকে তাকালাম। তারা মনে হচ্ছে দুঃখে কেঁদে ফেলবে। আমি তাদের দিকে মানিব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, ভাল করে দেখুনতো কোন ঠিকানা-লেখা কাগজ আছে কী না। আর টাকাটাও গুণে দেখুন। ঠিকানা পাওয়া

গেলে চলুন দিয়ে আসি। এতগুলি টাকা একা একা নিয়ে যাওয়া ঠিক না। আমার নাম হিমু আপনাদের পরিচয়টা কী?

ওস্তাদ বিড়বিড় করে বললেন, আমার নাম মোফাজ্জল। আর এ জহিরুল।

'ঠিকানা পাওয়া গেছে?'

টুকরা কাগজ অনেক আছে—কোনটা ঠিকানা কে জানে!

'ঐ দেখে দেখে বের করে ফেলব। আপনাদের কাজ না থাকলে চলুন আমার সঙ্গে। কাজ আছে?'

'না।'

তা হলে মানিব্যাগটা আপনার পকেটে রাখুন। আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আপনাদের পাওয়ায় আমার সুবিধাই হল।

মোফাজ্জল আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। আমি তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে তার চেয়েও বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলাম। বিচিত্র হাসি বিচিত্র হাসিতে কাটাকাটি।

কাওছার উৎসাহের সঙ্গে বলল, টেকাটা আগে গনেন। কত টেকা?

জহিরুল টাকা গুনছে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই গুনছে। কাওছার বলল, আরেক দফা চা দিমু হিমু ভাই?

'দাও।'

মোফাজ্জল ভাই, জহিরুল ভাই, আফনেরারে দিমু?

জহিরুল টাকা গোনায় ব্যস্ত। সে কিছু বলল না। মোফাজ্জল উদাস গলায় বলল, দাও।

আমরা রাত দুটার দিকে ঝিকাতলার এক টিনের বাড়ির দরজায় প্রবল উৎসাহে কড়া নাড়তে লাগলাম। আমরা কড়া নাড়ছি বলা ঠিক হচ্ছে না। আমি কড়া নাড়ছি, বাকি দুজন চিমশা মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এরা আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না, আবার সঙ্গে থাকার কোনো কারণও বোধহয় খুঁজে পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। পঞ্চাশ-ষাট হবে বয়স। মাথার চুল ধবধবে শাদা। ভদ্রলোক মনে হয় অসুস্থ। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আমাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছেন, কিন্তু চোখের পলক ফেলছেন না। আমি বললাম, আপনার কী কোনো মানিব্যাগ হারিয়েছে?

ভদ্রলোক কিছু বললেন না, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, মানিব্যাগে অনেকগুলি টাকা ছিল। আমার ধারণা আপনারই মানিব্যাগ।

ভদ্রলোক বাড়ির ভিতরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় ডাকলেন, মীরা! মীরা!

মীরা বের হয়ে এল। আমি হিমু না হয়ে অন্য কেউ হলে তৎক্ষণাৎ মেয়েটির প্রেমে পড়ে যেতাম। কী মিষ্টি যে তার মুখ! মনে হচ্ছে এইমাত্র সে গোসল করে

চোখে কাজল দিয়ে এসেছে। সব রূপবতী মেয়েদের চোখ বিষন্ন হয়। এই মেয়ের চোখও বিষন্ন।

ভদ্রলোক বললেন, মা, তোকে আমি বলেছিলাম না টাকাটা পাওয়া যাবে? এখন বিশ্বাস হল?

মীরা তাকাল আমার দিকে। আমি বললাম, ভাল আছেন?

মীরা ভুরু কুঁচকে ফেলল। আমি মোফাজ্জলের দিকে তাকিয়ে বললাম, মানিব্যাগ দিয়ে দিন। মোফাজ্জল কঠিন গলায় বলল, মানিব্যাগ যে উনাদের তার প্রমাণ কী?

আমি উদাস গলায় বললাম, প্রমাণ লাগবে না। মীরা, তুমি টাকাটা গুণে নাও।

মীরার কোচকানো ভুরু আরও কুঁচকে গেল। আমার মতো অভাজন তাকে তুমি করে বলবে তা সে মেনে নিতে পারছে না। মানিব্যাগ-সংক্রান্ত জটিলতা না থাকলে সে নিশ্চয়ই শুকনো গলায় বলত, আমাকে তুমি করে না বললে খুশি হব।

মোফাজ্জল অপ্রসন্ন মুখে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। এরকম অপ্রীতিকর কাজ সে মনে হয় তার জীবনে আর করেনি। মোফাজ্জলের চেয়েও বেশী মন খারাপ হয়েছে তার টেণ্ডল জহিরুলের। জহিরুলের মনে হয় মনের দুঃখে কেঁদেই ফেলবে।

ভদ্রলোক আবারও মীরাকে বললেন, বলেছিলাম না সব টাকা ফেরত পাব, বিশ্বাস হল? তুইতো কেঁদে অস্থির হচ্ছিলি। নে, টাকাটা গুনে দেখ। সাঁইত্রিশ হাজার নয়শ একুশো টাকা আছে।

মীরা বলল, গুনতে হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আহা-গুনে দেখ, না!

আমি বললাম, মীরা, তুমি সাবধানে গুনতে থাকো। আমরা চললাম।

শুরুতেই তুমি বলায় মেয়েটা রেগে গেছে, তাকে আবারো তুমি বলে আরও রাগিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম।

মোফাজ্জল ক্রুদ্ধ গলায় বলল, এতগুলা টাকা ফেরত পেয়েছে তার কোন আলামত নাই। শালার দুনিয়া! লাথি মারি এমন দুনিয়ারে!

জহিরুল বলল, এক হাজার টাকা বখশিশ দিলেওতো একটা কথা ছিল! কী বলেন ওস্তাদ। বখশিশ না দেওয়াটা অধর্ম হয়েছে।

আমি বললাম, বখশিশ পেলে কী করতেন?

জহিরুল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, কী আর করতাম-মাল খাইতাম। গত চাইরদিনে তিন আঙ্গুল পরিমাণ বাংলা খাইছি। তিন আঙ্গুল বাংলায় কী হয় কন। তিন আঙ্গুল মাল ইচ্ছা করলে একটা মশাও খাইতে পারে। মাল খাওয়া তো দূরের কথা, আজ সারাদিনে ভাতও খাই নাই। আপনার পিছে পিছে বেফিকির

হাঁটতেছি। আইজ যত হাঁটা হাঁটছি একটা ফকিরও অত হাঁটা হাঁটে না।

মোফাজ্জল বিরক্ত মুখে বলল, চুপ কর। এত কথার দরকার কী! হিমু ভাইয়া বিদায় দেন, আমরা এখন যাই।

'যাবেন কোথায়?'

'জানি না কই যাব।'

'আমার সঙ্গে চলেন, মাল খাওয়াব।'

মোফাজ্জল সরু চোখে তাকিয়ে রইল। সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করা খুবই কষ্টকর। মোফাজ্জল আছে সেই কষ্টে।

'কী, যাবেন?'

'সত্যি মাল খাওয়াবেন?'

'হুঁ।'

'কী খাওয়াবেন—বাংলা?'

'বাংলা ইংরেজি জানি না, তবে খাওয়াব।'

'চলেন যাই।'

মোফাজ্জল অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁটছে। তবে জহিরুলের চোখ চকচক করছে। কিছু মানুষ আছে যাদের জন্মই হয় শিষ্য হবার জন্যে। জহিরুল হল সেই মানুষ। এরা কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করে না। এরা বাস করে বিশ্বাসের জগতে। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।

জহিরুল বলল, হিমু ভাই, আপনেরে আমার পছন্দ হয়েছে।

'কেন?'

'জানি না কেন।'

'মাল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি এইজন্যে?'

'হইতে পারে। আপনের পকেটে সিগারেট আছে হিমু ভাই? একটা সিগারেট দেন ধরাই।'

'আমার পাঞ্জাবির পকেটই নেই, আবার সিগারেট।'

'সত্যই আপনের পাঞ্জাবির পকেট নাই!'

পাঞ্জাবির পকেট যে নেই তা আমি দেখালাম। মোফাজ্জল বলল, টাকাপয়সা কই রাখেন? পায়জামার সিক্রেট পকেটে?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমার কোনো সিক্রেট পকেট নেই। আমি সঙ্গে কখনো টাকাপয়সা রাখি না।

মোফাজ্জল আবারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জগতে চলে গেল। আগের অবস্থা, আমার কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। সে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। তবে জহিরুল আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

আমি তাদের নিয়ে বাদলদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। এত রাতে কারোরই জেগে থাকার কথা না, কিন্তু আমি জানি তারা সবাই জেগে আছে।

আমার মন বলছে– প্রবল ভাবেই বলছে। কিছু কিছু সময় আমার ইনটিউশন খুব কাজ করে।

আমি মেজো ফুপার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বাদলের ত্রিসীমানায় থাকব না। নির্বিঘ্নে বাদলের বিয়ে হয়ে যাবে। এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রাত আড়াইটায়– দুই উটকো লোক নিয়ে উপস্থিত হলে ঘটনা কী ঘটবে কে জানে! মেজো ফুপা ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবে নেবেন বলে মনে হয় না। তবে সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ যে তিনি ইতিমধ্যে বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছেন। কারণ আজ বুধবার। ফুপার মদ্যপান দিবস। বোতল নিয়ে বসার জন্যে সুন্দর অজুহাতও আছে— ছেলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে।। এই তো সেদিন ছোট্ট একটা ছেলে ছিল, শীতের দিনে বিছানায় পিপি করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলত, মা, কে যেন পানি ফেলে দিয়েছে। সে আজ বিয়ে করে বউ আনতে যাচ্ছে। এ তো শুধু আনন্দের ঘটনা না, মহা আনন্দের ঘটনা। সেই আনন্দটাকে একটু বাড়িয়ে দেবার জন্যে সামান্য কয়েক ফোঁটা দিয়ে গলা ভেজানো।

মেজো ফুপা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলে কোনো সমস্যা হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল এরাও ভাগ পাবে। মদ্যপায়ীরা মদের ব্যাপারে খুব দরাজ-দিল হয়। দশটা টাকা ধার চাইলে এরা দেবে না, কিন্তু তিন হাজার টাকা দামের বোতলের পুরোটা আনন্দের সঙ্গে অন্যকে খাইয়ে দেবে।

যা ভেবেছি তা-ই।

বাড়ির সব বাতি জ্বলছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আনন্দ উছলে পড়ছে। খোলা জানালায় সেই আনন্দ উছলে বের হয়ে আসছে। হাসির শব্দ, হৈচৈয়ের শব্দ, ছোট বাচ্চাদের কান্নাকাটির শব্দ। আমি কলিংবেলে হাত রাখার আগেই দরজা খুলে গেল। মেজো ফুপু দরজা খুললেন। তাঁর পরনে লাল বেনারসি, ইদানীংকার ফ্যাশানের মতো কপালে সিঁদুর। মেজো ফুপু হাসি মুখে বললেন, কী রে হিমু, তুই এত দেরি করলি? তোর জন্যে বাদল এখনও না খেয়ে বসে আছে।

আমি হাসলাম। "দেরি করার অপরাধে খুবই লজ্জিত" এই টাইপের হাসি। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি না। বাদলের বিয়ে হয়ে গেল না-কি? বিয়ে বোধ হয় না। মনে হচ্ছে গায়ে হলুদ। ফুপুর কপালে হলুদ লেগে আছে।

'আশ্চর্য, একটা দিন সময়মতো আসবি না, আমি কি রোজই ছেলের বিয়ে দেব? গায়ে হলুদের এমন জমজমাট অনুষ্ঠান— আর তুই নেই। বাদল অস্থির হয়ে আছে তোর জন্যে। ঝিম মেরে আছিস ব্যাপার কি? কথা বলছিস না কেন?

'তোমাকে আসলে চিনতেই পারি নি। এইজন্যেই চুপ করে ছিলাম। মাই গড, তোমাকে তো দারুণ লাগছে! কে বলবে তোমার ছেলের বিয়ে! মনে হচ্ছে তোমারই বিয়ে হয় নি।'

'পাম-দেয়া কথা বলবি না তো! দরজায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, ভেতরে আয়।'

আমি গলা নিচু করে বললাম, ফুপু, আমার দুজন গেস্ট আছে, ওদের নিয়ে আসব?

'ওরা কোথায়?'

'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বাড়িতে ঢুকতে দাও কী না-দাও জানি না তো।'

'তোর কী বুদ্ধিশুদ্ধি দিন-দিন চলে যাচ্ছে নাকি? আমার ছেলের বিয়েতে তুই বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবি না তো কী পাড়ার লোকের বিয়েতে আসবি! আর তোর আক্কেলটাই-বা কীরকম রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলি কোন হিসাবে ওরা না জানি কী ভাবছে।'

'কিছুই ভাবছে না, আমি নিয়ে আসছি। ফুপা কী বাসায় আছেন?'

'বাসায় থাকবে না তো যাবে কোথায়? একটা অজুহাত পেয়েছে ছেলের বিয়ে— বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছে। বাড়িভরতি লোকজন। না জানি কী ভাবছে।'

'তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে ফুপু! শাড়ি কী কোনো নতুন কায়দায় পরেছ? মোটাটা অনেকটা ঢাকা পরেছে।'

'সত্যি বলছিস?'

'অবশ্যই সত্যি বলছি।'

রীণাও বলছিল আমাকে নাকি স্লিম লাগছে। তুই কথা বলে সময় নষ্ট করিস না তো তোর বন্ধুদের নিয়ে আয়। আমি খাবার গরম করছি।

'বন্ধুরা কিছু খাবে না ফুপু। ওরা খেয়ে এসেছে। আমি বাদলের সঙ্গে খাব, ওরা ছাদে বসে ফুপার সঙ্গে গল্প করবে।'

ফুপা আমাকে দেখে আনন্দে অভিভূত হলেন। মাতালরা একটা পর্যায়ে যে-কোনো ব্যাপারে আনন্দে অভিভূত হয়। তাঁর এখন সেই অবস্থা চলছে। ফুপার মনেই নেই যে তিনি আমাকে আসতে নিষেধ করেছেন।

'আরে হিমু! হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

ফুপা এরা হল আমার দুই বন্ধু, একজন মোফাজ্জল আর একজন জহিরুল।

ফুপা, মধুর গলায় বললেন, তোমরা কেমন আছ? তুমি করে বললাম। কিছু মনে কোরো না আবার। হিমু হচ্ছে আমার ছেলের মতো সেই হিসেবে তোমরাও আমার ছেলে। হা হা হা, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসো। খুব ঠাণ্ডা তো, এইজন্যেই দুফোঁটা হুইস্কি খাচ্ছি। তার উপর ছেলের বিয়ে মহা আনন্দের ব্যাপার। মেয়ের বিয়ে হলে কষ্টের ব্যাপার হত। মেয়ের বিয়ে মানে মেয়ের বিদায়। ছেলের বিয়ে মানে নতুন একটা মেয়েপ্রাপ্তি। এই উপলক্ষে সামান্য মদ্যপান করা যায়। ঠিক না?

জহিরুল বলল, এই দিনে যদি মদ না খান খাবেন কবে!

'এই ব্যাপারটাই তো তোমাদের ফুপুকে বোঝাতে পারছিলাম না। শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়ে মেয়েরা ধরেই নিয়েছে মদ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। পরিমিত মদ্যপান যে হার্টের কত বড় অষুধ তা এরা জানে না। টাইম পত্রিকায় একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে সেখানে পরিষ্কার লেখা যারা পরিমিত মদ্য পান করে তাদের হার্ট এটাকের রিস্ক অর্ধেক কমে যায়। তোমরা কী একটু খেয়ে দেখবে?

মোফাজ্জল বলল, জ্বি না, জ্বি না। আপনি মুরুব্বি মানুষ।

লজ্জা করবে না তো, খাও। এত বড় একটা আনন্দ-উৎসবে আমি একা একা বসে আছি। তোমরা আসায় তাও কথা বলার লোক পাচ্ছি। হিমু যা তো দুটা গ্লাস এনে দে। বোতল আরেকটা লাগবে। আমার ঘরে চলে যা। বুক শেলফের তিন নম্বর তাকে বইগুলার পেছনে একটা ব্লাক ডগের বোতল আছে। এইসব জিনিস একা খেয়ে কোনো আনন্দ নেই—তাই না তফাজ্জল?

'স্যার, আমার নাম মোফাজ্জল।'

'স্যার বলছ কেন? আমি হিমুর ফুপা, তোমারও ফুপা। এই যে গুটকা ছেলেটা তারও ফুপা। তোমার নাম যেন কী?'

'জহিরুল।'

'গুটকা ছেলে বলায় রাগ কর নি তো?'

'জ্বি না।'

'তোমার ফুপুকে দেখার পর পৃথিবীর যে-কোনো মানুষকেই আমার কাছে গুটকা মনে হয়। একবার কী হয়েছে শোনো প্লেনে করে চিটাগাং যাচ্ছি। সে দেখি প্লেনের সীটে ঢোকে না। হাস্যকর ঘটনা। এয়ার হোস্টেস, আমি দুজনে মিলে ঠেলাঠেলি। এখনো মনে করলে লজ্জায় মরে যাই।'

আমি নিচে চলে এলাম। মোফাজ্জল আর জহিরুলকে নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। তারা মনের সুখে ব্ল্যাক ডগ খেতে পারবে। ফুপা যত্ন করে মুখে তুলে তুলে খাওয়াবেন। বোতল শেষ হলেও কোনো সমস্যা নেই। বিচিত্র সব জায়গা থেকে নতুন নতুন বোতল বের হবে। শেষের দিকে সিচুয়েশন আউট অব হ্যান্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অবিশ্যি আছে। এক মাতাল হয় বিষণ্ণ প্রকৃতির, দুই মাতাল হয় মিত্রভাবাপন্ন। তিন মাতাল সর্বদাই ভয়াবহ।

খাওয়া শেষ করে আমি বাদলের ঘরে গিয়ে বসেছি। বাদলের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে রাখি। চোখেমুখে লজ্জিত একটা ভাব। বিবাহ-নামক অপরাধ করতে যাচ্ছে এই কারণে সে যেন ছোট হয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছেও খুব সুন্দর। বিয়ের আগে-আগে শুধু যে মেয়েরাই সুন্দর হয়ে যায় তা না, ছেলেরাও সুন্দর হয়। আমি বাদলের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি।

'বাদল, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। গায়ের রঙও তো মনে হয় খোলতাই

হয়েছে।'

বাদল হাসিমুখে বলল, হলুদ দিয়ে ডলাডলি করে গায়ের চামড়া তুলে ফেলেছে, রঙ তো খোলতাই হবেই।

'বিয়ে হচ্ছে যার সঙ্গে সেই মেয়েটার নাম কী?'

'পুরানো ধরনের নাম—আঁখি।'

'মেয়েটা কেমন?'

'জানি না কেমন। কথা হয়নি তো।'

'খুব সুন্দর?'

'সবাই তো তা-ই বলছে।'

'তুই বলছিস না?'

বাদল লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, আমিও বলছি।

'তোর খুব ভাল একটা দিনে বিয়ে হচ্ছে। ২২ ডিসেম্বর। অদ্ভুত।'

'২২ ডিসেম্বর কী খুব শুভদিন হিমু দা?

'বৎসরের সবচেয়ে লম্বা রাতটা হল ২২ ডিসেম্বরের রাত। তোরা দুজন গল্প করার জন্যে অনেক সময় পাবি। এই কারণেই শুভ।

বাদল লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, আঁখির সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব সেটাই বুঝতে পারছি না। বোকার মতো হয়তো কিছু বলব, পরে সে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

'করুক-না হাসাহাসি। তোর যা মনে আসে তুই বলবি। দুই একটা কবিতা টবিতা মুখস্ত করে যা।'

'কী কবিতা?'

'প্রেমের কবিতা।'

'প্রেমের তো অনেক কবিতা আছে কোনটা মুখস্থ করব সেটা বলো।'

'কোনটা বলব, আমার তো দুই-তিন লাইনের বেশি কোনো কবিতা মনে থাকে না।'

'দুই-তিন লাইনই বলো। এক সেকেণ্ড দাঁড়াও-আমি কাগজ কলম নিয়ে আসি—লিখে ফেলি।'

বাদল গম্ভীর ভঙ্গিতে বলপয়েন্ট আর কাগজ নিয়ে বসেছে। আমি কবিতা বলব, সে লিখে মুখস্থ করবে, বাসররাতে তার স্ত্রীকে শোনাবে। হাস্যকর একটা ব্যাপার কিন্তু আমার কেন জানি হাস্যকর লাগছে না। বাদল বলল, কই, চুপ করে আছ কেন, বলো।

আমি বললাম, লিখে ফেল—

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে পাহাড় তাকে সয় না।

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
কীভাবে হয়? কেমন করে হয়?
কেমন করে ফুলের কাছে রয়
গন্ধ আর বাতাস দুই জনে....
এভাবে হয়, এমন ভাবে হয়।

বাদল বলল, এটা কার কবিতা, তোমার?

'পাগল হয়েছিস? আমি কবিতা লিখি নাকি? এই কবিতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।'

'কতদিন পর তোমাকে দেখছি কি যে অদ্ভুত লাগছে।'

'অদ্ভুত লাগছে?'

'হুঁ লাগছে। আঁখির সঙ্গে বেশী গল্প হবে তোমাকে নিয়ে।'

'ওকে নিয়ে আবার খালিপায়ে হাঁটতে বের হবিনাতো।'

'অবশ্যই বের হব। আমি পরব হলুদ পাঞ্জাবী, ওকে পরাব হলুদ শাড়ি। তারপর .....'

'তারপর কি?'

'সেটা বলতে পারব না। লজ্জা লাগছে। হিমুদা শোন তোমার জন্যে আমি খুব সুন্দর একটা গিফট এনেছি। আন্দাজ করতো কি?'

'আন্দাজ করতে পারছি না।'

'একটা খুব দামী স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে এসেছি। তুমিতো যেখানে সেখানে রাত কাটাও— ব্যাগটা থাকলে সুবিধা— ব্যাগের ভেতর ঢুকে পরবে। স্লিপিং ব্যাগের কালার তোমার পছন্দ হবে না। মেরুন কালার। অনেক খুঁজেছি- হলুদ পাইনি।'

বাদল স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে- অনেক টাকা দিয়ে কিনেছে।

'হিমুদা পছন্দ হয়েছে?'

'খুব পছন্দ হয়েছে।'

'ব্যাগটা থাকায় তোমার খুব সুবিধা হবে। ধর তুমি জঙ্গলে জোছনা দেখতে গিয়েছ। অনেক রাত পর্যন্ত জোছনা দেখলে- ঘুম পেয়ে গেলে- কোন একটা গাছের নিচে ব্যাগ রেখে তার ভেতর ঢুকে গেলে।'

'আমারতো এখনই ব্যাগ নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আমারো ইচ্ছে করছে— হিমুদা চল কাছে পিছের কোন একটা জঙ্গলে চলে যাই— জয়দেবপুরের শালবনে গেলে কেমন হয়।'

'বিয়ের আগে তোর কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বিয়ে হয়ে যাক তারপর তুই আর আঁখি, হিমু ও হিমি ....'

আমি বাক্যটা শেষ করার আগেই রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ফুপু ঢুকলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে খরখরে গলায় বললেন, তুই কাদের নিয়ে বাসায়

এসেছিস? বাঁদর দুটাকে জোগাড় করেছিস কোথায়?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কেন, ওরা কী করেছে?

'দুটাই তো নেংটো হয়ে ছাদে নাচানাচি করছে। তোর ফুপাও নাচছে।'

'বল কী।'

'তুই এক্ষুণি এই মুহূর্তে এদের নিয়ে বিদেয় হবি।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। আমার বগলে বাদলের আনা মেরুন রঙের স্লিপিং ব্যাগ।

ফুটপাতে যারা ঘুমায় দেখা যাচ্ছে তাদের কিছু নীতিমালা আছে। তারা জায়গা বদল করে না। ঘুমুবার জায়গা সবারই নির্দিষ্ট। যে নিউমার্কেটের পাশে ঘুমায় সে যদি সন্ধ্যাবেলায় বাসাবোতে থাকে— সেও হেঁটে হেঁটে নিউমার্কেটের পাশে এসে নিজের জায়গায় ঘুমুবে।

কাজেই বস্তা ভাইকে খুঁজে বের করতে আমার অসুবিধা হল না। দেখা গেল সাত দিন আগে তারা যেখানে ঘুমুচ্ছিল এখনো সেখানেই ঘুমুচ্ছে। পিতা এবং পুত্র চটের ভেতরে ঢুকে আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। আমি তাদের ঘুম ভাঙ্গালাম। বস্তা ভাইয়ের পুত্রের বয়স খুবই কম। চার পাঁচ বছর হবে। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গায় সে খুবই ভয় পেয়েছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বললাম— এই গাবলু তোর নাম কি?

গাবলু জবাব দিল না। বাবার কাছে সরে এল। বাবা বিরক্ত মুখে বলল, আফনের কি বিষয়? চান কি?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমাকে চিনতে পারছেন না। আমি হচ্ছি আপনাদের সহনিদ্রক। একসঙ্গে ঘুমালাম— মনে নেই। শেষ রাতে জ্বর উঠে গেল। আপনি রিকশা ডেকে- আমাকে ধরাধরি করে তুলে দিলেন।

'মনে আছে। আপনে চান কি?'

'কিছু চাই না। আপনাদের সঙ্গে ঘুমাব— অনুমতি চাচ্ছি।'

'অনুমতির কি আছে গভমেন্টের জায়গা। ঘুমাইতে ইচ্ছা হইলে ঘুমাইবেন।'

আমি তাদের পাশে আমার স্লিপিং ব্যাগ বিছালাম। পিতা এবং পুত্র দু'জনেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। ব্যাগের জীপার খুলে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তাদের বিষ্ময়ের সীমা রইল না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই জিনিশটার নাম স্লীপিং ব্যাগ। এর অনেক সুবিধা- ভেতরে ঢুকে জীপার লাগিয়ে দিলে— শীত লাগবে না, মশা কামড়াবে না। বৃষ্টির সময় ভিজতে হবে না। চোর এসে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে না। চোর যদি নিতে চায় আমাকে শুদ্ধ নিতে হবে।

বস্তা ভাই তার বিস্ময় সামলাতে পারল না। ক্ষীণ স্বরে বলল, এই জিনিসটার

দাম কি রকম ভাইজান?

আমি ঘুম ঘুম গলায় বললাম, জানি না। বলেই জীপার লাগিয়ে দিলাম। স্লিপিং ব্যাগটা আমি আসলে এনেছি এই দু'জনকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেবার জন্যে। হিমুরা স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে পথে হাঁটে না। আমি ঠিক করেছি বাকি রাতটা স্লীপিং ব্যাগে ঘুমুব। সকালে ব্যাগ থেকে বের হয়ে এক কাপ চা খাব। তারপর পিতা এবং পুত্রকে ব্যাগটা উপহার দিয়ে চলে যাব। আহা এই দু'জন আরাম করে ঘুমাক। ছেলেটার চেহারা খুব মায়াকাড়া। কি নাম ছেলেটার? আচ্ছা নামটা সকালে জানলেও হবে। এখন ভাল ঘুম পাচ্ছে। সামান্য দুঃশ্চিন্তাও হচ্ছে বাদলদের বাড়ি থেকে মোফাজ্জল এবং জহিরুলকে নিয়ে আসা হয় নি। এরা এতক্ষণে কি কান্ড করছে কে জানে? মনের আনন্দে ছাদ থেকে লাফিয়ে না পড়লেই হয়।

স্লীপিং ব্যাগটা আসলেই আরামদায়ক। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

'ভাইজান, ও ভাইজান।'

'কি?'

'আমার ছেলে আফনের এই জিনিসটা একটু হাত দিয়া ছুইয়া দেখতে চায়।'

'উহুঁ ময়লা হবে। হাত যেন না দেয়।'

'জ্বে আচ্ছা।'

'ছেলের নাম কি?'

'সুলায়মান।'

'ছেলের মা কোথায়?'

'সেইটা ভাইজান এক বিরাট হিস্টুরি।'

'থাক বাদ দিন, বিরাট হিস্টুরি শোনার ইচ্ছা নেই ঘুম পাচ্ছে।'

'ভাইজান?'

'হুঁ।'

'জিনিসটার ভিতরে কি দুইজন শোয়া যায়?'

'তা যায়। বড় করে বানানো।'

'বালিশ আছে?'

'না বালিশ নেই। বালিশের দরকার হয় না।'

'যদি কিছু মনে না নেন ভাইজান, সুলেমান জিনিশটার ভিতরে কি একট দেখতে চায়। তার খুব শখ হইছে।'

আমি ভেতর থেকে বের হয়ে এলাম। পিতা এবং পুত্রের কাছে ব্যাগ বুঝিয়ে দিলাম। তারা হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হতভম্ব দৃষ্টি দেখে আমার চোখে পানি আসার উপক্রম হল। হিমুদের চোখে পানি আসতে নেই—আমি ওদের পেছনে ফেলে দ্রুত হাঁটছি। রাস্তার শেষ মাথায় এসে একবার পেছনে ফিরলাম। পিতা পুত্র দু'জনই ব্যাগের ভেতর ঢুকেছে। দু'জনই মাথা বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কে জানে তারা কি ভাবছে।

ঘুম ভেঙেই দেখি আমার বিছানার পাশের চেয়ারে বাদল বসে আছে। আমি চট করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সাতসকালে বাদলের আমার পাশে বসে থাকার কথা না। আজ ২৩ ডিসেম্বর। কাল রাতে তার বিয়ে হয়েছে। বউ ফেলে ভোরবেলাতেই সে আমার কাছে চলে আসবে কেন? চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা একটু চিন্তা করা যাক।

আমি থাকি আগামসি লেনের একটা মেসে। মেসের ঠিকানা বাদল জানে না। শুধু বাদল কেন, আমার পরিচিত কেউই জানে না। বাদলকে সেই ঠিকানা খুঁজে বের করতে হয়েছে। সেটা তেমন জটিল কিছু না—আগে যে-মেসে ছিলাম সেই মেসের ম্যানেজার নিতাই কুণ্ডু বর্তমান মেসের ঠিকানা জানেন। তাকে যদিও বলা হয়েছে আমার ঠিকানা কাউকে দেবেন না—তার পরেও ভদ্রলোক দিয়েছেন। বাদল নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছে বা করেছে যে ঠিকানা না দিয়ে ভদ্রলোকের উপায় ছিল না। খুব সম্ভব কেঁদে ফেলেছে। বাদল খুব সহজে কাঁদতে পারে।

একবার মেসে ঢুকে পরার পর আমার ঘরে ঢোকা অবিশ্যি খুবই সহজ। আমি দরজা এবং জানালা সব খোলা রেখে ঘুমাই। হিমুকে তা-ই করতে হয়। আমার বাবা আমার জন্যে যে উপদেশনামা লিখে রেখে গেছেন তার সপ্তম উপদেশ হচ্ছে—

> নিদ্রা ও জাগরণের যে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, যেমন দিবসে জাগরণ নিশাকালে নিদ্রা—এইসব নিয়ম মানিয়া চলার কোনো আবশ্যকতা নাই। কোন রকম বন্ধনে নিজেকে বাঁধিও না। খোলা মাঠ বা প্রান্তরে নিদ্রা দিতে চেষ্টা করিবে। কোনো প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলে সেই প্রকোষ্ঠের দরজা-জানালা সবই খুলিয়া রাখিবে যেন নিদ্রাকালে খোলা প্রান্তরের সহিত তোমার নিদ্রাকক্ষের যোগ সাধিত হয়।
>
> নিদ্রাকালে তস্কর বা ডাকাত আসিয়া তোমার মালামাল নিয়া পলায়ন করিবে এই চিন্তা মাথায় রাখিও না, কারণ তস্কর আকর্ষণ করিবার মতো কিছু তোমার কখনোই থাকিবে না। যদি থাকে তবে তাহা তস্কর কর্তৃক নিয়া যাওয়াই শ্রেয়।

বাবার উপদেশ আমি অনেক দিন থেকেই মেনে চলছি। খোলা প্রান্তরে শোয়া সম্ভব হচ্ছে না—দরজা-জানালা খোলা ঘরে ঘুমুচ্ছি। তস্করের হাতে পড়েছি তিনবার। প্রথমবার সে একটা দামি জিনিসই নিয়ে গেছে—ওয়াকম্যান। সনি কোম্পানীর ওয়াকম্যান আমাকে উপহার দিয়েছিল রূপা। রূপার উপহার দেয়ার পদ্ধতি খুব সুন্দর। গিফট র‍্যাপে মুড়ে লাল রিবনের ফুল লাগিয়ে বিরাট শিল্পকর্ম। রূপা গিফট আমার হাতে দিয়ে বলল, নাও, তোমার জন্মদিনের উপহার।

আমি বললাম, আজ তো আমার জন্মদিন না।

'সে নিজের মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, তোমার কবে জন্মদিন সেটা তো আমি জানি না। তুমি আমাকে বলবেও না। কাজেই আমি ধরে নিলাম আজই জন্মদিন।'

'ও আচ্ছা।'

ও আচ্ছা না, বলো থ্যাংক য়্যুও। উপহার পেলে ধন্যবাদ দেয়া সাধারণ ভদ্রতা। মহাপুরুষরা ভদ্রতা করেন না, তা তো না।

'ধন্যবাদ। কী আছে এর মধ্যে?'

'একটা ওয়াকম্যান। তুমি তো পথে পথেই ঘুরে বেড়াও। মাঝে মাঝে এটা কানে দিয়ে ঘুরবে। আমার পছন্দের তেরো টা গান আমি রেকর্ড করে দিয়েছি।'

'আবারো ধন্যবাদ।'

আমি খুব যত্ন করে টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় রূপার উপহার সাজিয়ে রাখলাম। সাজিয়ে রাখা পর্যন্তই। ব্যাটারির অভাবে গান শোনা গেল না। রূপা মূল যন্ত্র দিয়েছে, ব্যাটারি দেয় নি। আমারও কেনা হয় নি। মাঝে মাঝে যন্ত্রটা শুধুশুধু কানে দিয়ে বসে থাকতাম। কানের ফুটো বন্ধ থাকার জন্যেই বোধহয় শোঁশোঁ শব্দ হত। সেই শব্দও কম ইন্টারেস্টিং ছিল না। যাই হোক এক রাতে চোর (বাবার ভাষায়—তস্কর) এসে আমাকে ব্যাটারি কেনার যন্ত্রণা থেকে বাঁচাল।

দ্বিতীয় দফায় তস্কর এসে আমার স্যান্ডেলজোড়া নিয়ে গেল। হিমুর স্যান্ডেল থাকার কথা না—খালিপায়ে হাঁটাহাটি করার কথা। তারপরও একজোড়া চামড়ার স্যান্ডেল কিনেছিলাম। দাম নিয়েছিল দুশো তেত্রিশ টাকা। সাতদিনের মাথায় স্যান্ডেল চলে গেল।

তৃতীয় দফায় চোরের হাতে আমার বিছানার চাদর এবং বালিশ চলে গেল। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় চোর কী করে বিছানার চাদর এবং বালিশ নিয়ে গেল সেই রহস্যের সমাধান এখনও হয় নি।

চোর-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কিছু নেই—আমার সামনে জটিল সমস্যা বসে আছে—বাদল। আমি চট করে দ্বিতীয়বার তাকে দেখে নিলাম। তার চোখেমুখে হতভম্ব ভাব। রাতে একফোটাও ঘুমায় নি তাও বোঝা

যাচ্ছে। চোখের নিচে এক রাতেই কালি পড়ে গেছে। আনন্দময় নিশি জাগরণে চোখের নিচে কালি পড়ে না। কাজেই গত রাতটা তার কাছে ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তা হলে কী তার বিয়ে হয় নি?

আমি চোখ বন্ধ রেখেই বললাম, বাদল, তোর বিয়েটা কী কোনো কারণে ভেঙে গেছে?

বাদল বলল, হুঁ।

'চা খাবি?'

'হুঁ।'

'নিচে চলে যা। রাস্তা পার হলেই দেখবি তোলা উনুনে বাচ্চা একটা ছেলে চা বানাচ্ছে। ওর নাম মফিজ। মফিজকে বলে আয় দুকাপ চা পাঠাতে।'

'আমার বিয়েটা যে ভেঙে যাবে সেটা কী তুমি আগে থেকেই জানতে?'

'আগে থেকে জানব কীভাবে? আমি কী পীর-ফকির নাকি?'

'আমার মনে হয় তুমি জানতে। জানতে বলেই বরযাত্রী হিসেবে তুমি বিয়েতে যাও নি।'

'বরযাত্রী হিসেবে যাই নি কারণ আমাকে ফুপা নিষেধ করে দিয়েছিলেন।'

'তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি—তা হলে তুমি বুঝলে কী করে যে আমার বিয়ে হয় নি।'

'তোর চেহারা দেখে বুঝেছি। মানুষের সমগ্র অতীত তার চেহারায় লেখা থাকে। যারা সেই লেখা পড়তে পারে তারা মানুষকে দেখেই হড়হড় করে অতীত বলে দিতে পারে।'

'তুমি পার।'

বেশি পারি না—সামান্য পারি। যা, চা'র কথা বলে আয়।

বাদল উঠে দাঁড়াল। বাদলের চেহারা খুব সুন্দর। আজ এই সকালের আলোতে তাকে আরও সুন্দর লাগছে। ক্রীম কালারের এই শার্টটা তাকে খুব মানিয়েছে। যদি বিয়েটা হত তা হলে ভোরবেলায় বাদলকে দেখে আঁখি মেয়েটার মন ভাল হয়ে যেত। যতই মেয়েটা বাদলের কাছাকাছি যেত ততই সে বাদলকে পছন্দ করত। আমার ফুপা এবং ফুপুর চরিত্রের ভাল যা আছে তার সবই আছে বাদলের মধ্যে। ফুপা এবং ফুপুর অন্ধকার দিকের কিছুই বাদল পায় নি। বাদলের জন্যে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদিও হিমুর মন-খারাপ হতে নেই। বাবার উপদেশনামার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে—

> জগতের কর্মকাণ্ড চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া যাইবে। কোনোক্রমেই বিচলিত হইবে না। আনন্দে বিচলিত হইবে না, দুঃখেও বিচলিত হইবে না। সুখ দুঃখ এইসব নিতান্তই তুচ্ছ মায়া। তুচ্ছ মায়ায় আবদ্ধ থাকিলে জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না।

মুশকিল হচ্ছে, জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বোঝার জন্যে কোনোরকম

ব্যস্ততা এখনো তৈরি হয় নি। আমার আশেপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মায়া আমাকে বড়ই বিচলিত করে।

মফিজ আমার জন্য যে চা বানায় তার নাম— ইসপিসাল, ডাবলপাত্তি। এই চায়ের বিশেষত্ব হচ্ছে ঘন লিকার, প্রচুর দুধ, প্রচুর চিনি। ইসপিসাল চা কাপে করে আসে না— প্রমাণ সাইজের গ্লাস ভরতি হয়ে আসে। এক গ্লাস ইসপিসাল ডাবলপাত্তি খেলে সকালের নাশতা খেতে হয় না।

বাদল চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। তার মুখ থমথম করছে। আমি বললাম, সিগারেট খাবি?

'না, সিগারেট তো খাই না।'

'চা খেতে খেতেই ঘটনা কী বল।'

'ঘটনা বলে কী হবে?'

তা হলে ভোর রাতে এসেছিস কেন?'

বাদল চুপ করে রইল। আমি বললাম, কিছু বলতে ইচ্ছে না করলে বলতে হবে না। চা খেয়ে চলে যা।

'দেখি একটা সিগারেট দাও, খাই।'

আমি সিগারেট দিলাম। বাদল সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে প্রফেশন্যালদের মতো টানছে। নাকে মুখে ভোস ভোস করে ধুয়া ছাড়ছে।

'হিমু দা!'

'বল।'

'বলার মতো কোনো ঘটনা না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমরা তো সবাই গেলাম—পনেরোটা গাড়ি, দুটো মাইক্রোবাসে প্রায় একশোজন বরযাত্রী। আগে থেকে কথা হয়ে আছে রাত আটটায় কাজী চলে আসবে। বিয়ে পড়ানো হবে। কাবিনের এমাউন্ট নিয়ে যেন ঝামেলা না হয় সেজন্যে সব আগে থেকেই ঠিকঠাক করা। পাঁচ লক্ষ এক টাকা কাবিন।

কাজী চলে এল আটটার আগেই। উকিল বাবা কবুল পড়িয়ে মেয়ের সই নিতে যাবে মেয়ের বাবা বললেন, একটু সবুর করুন। নয়টা বেজে গেল। মেয়েপক্ষরা হঠাৎ বলল, আপনাদের খাওয়া হয়ে যাক। দুই, তিন ব্যাচে খাওয়া হবে, সময় লাগবে। তখন বাবা বললেন, বিয়ে হোক, তারপর খাওয়া। বিয়ের আগে কিসের খাওয়া! মেয়ের মামা বললেন—একটু সমস্যা আছে। সামান্য দেরি হবে।

কী ব্যাপার তারা কিছুতেই বলতে চায় না। অনেক চাপাচাপির পর যা জানা গেল তা হল—মেয়ের নাকি সকালবেলায় তার মা'র সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে। মেয়ে রাগ করে তার কোন এক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে। সেখান থেকে টেলিফোন করেছিল, বলেছে চলে আসবে। কোথায় আছে তা কেউ জানে না বলে তাকে আনার জন্যেও কেউ যেতে পারছে না।

বাবা রাগ করে বললেন, মেয়ে কী তার প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে? এই কথায় মেয়ের মামা খুব রাগ করে বললেন, এইসব নোংরা কথা কী বলছেন? আমাদের মেয়ে সেরকম না। মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। টেলিফোনে কথা হয়েছে। চলে আসবে, একটু অপেক্ষা করুন।

আমরা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বাসায় এসেও বিরাট লজ্জায় পড়লাম। বাবা বাসায় ব্যান্ডপার্টির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। বর-কনে আসবে ব্যাণ্ড বাজা শুরু হবে। আমাদের ফেরত আসতে দেখে ব্যান্ড বাজা শুরু হল। উদ্দাম বাজনা। পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল। লজ্জায় আমার ইচ্ছা করছিল.....

'কী ইচ্ছা করছিল?'

বাদল চুপ করে গেল। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় চোখের পানি সামলাচ্ছে। আমি বললাম, তুই আমার কাছে এসেছিস কেন?

'এম্নি এসেছি। মনটা ভাল করার জন্যে এসেছি।'

'মন ভাল হয়েছে?'

'না।'

'তা হলে চল আমার সঙ্গে হাঁটাহাঁটি করবি। হাঁটাহাঁটি করলে মন ভাল হয়।'

'কে বলেছে?'

'আমি বলছি।'

বাদল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

'চিড়িয়াখানায় যাবি?'

'চিড়িয়াখানায় যাব কেন?'

'জীবজন্তু দেখলে মন দ্রুত ভাল হয়। চল বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি দেখে আসি। তারপর চল হাতির পিঠে চড়ি। পারহেড দশ টাকা নিয়ে ওরা হাতির পিঠে চড়ায়। তোর কাছে টাকা আছে তো?'

'আছে! আমরা মীরপুর পর্যন্ত কী হেঁটে যাব?'

'অবশ্যই! ভাল কথা—তোর "হতে পারত শ্বশুরবাড়ির" টেলিফোন নাম্বার কী তোর কাছে আছে? টেলিফোন করে দেখতাম আঁখি বাসায় ফিরেছে কী না। একটা মেয়ে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—সে ফিরেছে কি-না সেটা জানা আমাদের দায়িত্ব না? আছে টেলিফোন নাম্বার?'

'হুঁ।'

'তুই ওদের টেলিফোন নাম্বার পকেটে নিয়ে ঘুরছিস কেন?'

'পকেটে করে ঘুরছি না—তোমার এখানে আসা যখন ঠিক করেছি তখন

মনে হয়েছে তুমি ওদের টেলিফোন নাম্বার চাইতে পার, তাই মনে করে নিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছিস।'

'তুমি কী সত্যি মিরপুর পর্যন্ত হেঁটে যাবে?'

'হুঁ। ঘণ্টা দুএক লাগবে—এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম। মনে হচ্ছে আজকের দিনটি হবে আমার জন্যে কর্মব্যস্ত একটি দিন।

পথে নেমেই শুনি কোকিল ডাকছে। তার মানে কী? শীতকালে কোকিল ডাকছে কেন?

'বাদল!'

'হুঁ।'

'কোকিল ডাকছে শুনছিস?'

'হুঁ।'

'ব্রেইন ডিফেক্ট কোকিল—অসময়ে ডাকাডাকি করছে।'

'হুঁ।'

তুই কী ঠিক করেছিস হুঁর বেশি কিছু বলবি না?

'কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'কোকিল সম্পর্কে একটা তথ্য শুনবি?'

'বলো।'

'কোকিলের গলা কিন্তু এম্নিতে খুব কর্কশ। সে মধুর গলায় তার সঙ্গীকে ডাকে মেটিং সিজনে। তখনই কোকিল কণ্ঠ শুনে আমরা মুগ্ধ হই।'

'ভাল।'

'তোর কী একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না?'

'না।'

'পথে হাঁটার নিয়ম জানিস।'

'হাঁটার আবার নিয়ম কী হাঁটলেই হল।'

'সবকিছুর যেমন নিয়ম আছে—হাঁটারও নিয়ম আছে। হাটতে হয় একা একা। বল তো কেন?

'জানি না।'

'দুজন বা তারচেয়ে বেশি মানুষের সঙ্গে হাঁটলে কথা বলতে হয়। কথা বলা মানেই হাঁটার প্রথম শর্ত ভঙ্গ করা। হাঁটার প্রথম শর্ত হচ্ছে—নিঃশব্দে হাঁটা।'

'হুঁ।'

'হাঁটার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে হাঁটার সময় চারদিকে কী হচ্ছে দেখা কিন্তু খুব গভীর ভাবে দেখার চেষ্টা না করা। ইংরেজিতে "Glance"—চট করে তাকানো, "Look" না।'

'হুঁ।'

'হাঁটার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে পথে কোথাও থামা চলবে না। কাজেই তুই চট করে দাঁড়িয়ে পরবি না।'

'আচ্ছা।'

'পেছন দিকে তাকানো চলবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোর কী একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?'

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, 'বাদল তুই হাঁটার চতুর্থ শর্ত ভঙ্গ করছিস।

'চতুর্থ শর্তটা কী?'

'তুই মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিস। হাটার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা চলবে না।'

'ও আচ্ছা।'

'তোর হাঁটতে কষ্ট হলে রিকশা নিয়ে নি।'

'কষ্ট হচ্ছে না।'

'আচ্ছা তুই একটা প্রশ্নের জবাব দে। খুব সহজ প্রশ্ন। রিকশাওয়ালাদের রিকশায় প্যাডেল চাপতে হয়। এই কাজটা করার জন্যে তাদের সবচে ভাল পোশাক হচ্ছে ফুলপ্যান্ট কিংবা পায়জামা। পুরানো কাপড়ের দোকানে সস্তায় ফুলপ্যান্ট পাওয়া যায়। রিকশাওয়ালারা কিন্তু কেউই ফুলপ্যান্ট বা পায়জামা পরে না। তারা সব সময় পরে লুঙ্গি। এখন বল কেন? খুব সহজ ধাধা।'

'জানি না কেন। ধাঁধা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'কী নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে?'

'কোনোকিছু নিয়েই ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'চোখের কতগুলি প্রতিশব্দ বল তো। প্রথমটা আমি বলে দিচ্ছি—আঁখি।'

'বললামতো হিমুদা ধাঁধার খেলা খেলতে ইচ্ছা করছে না।'

'আহা আয়-না একটু খেলি— বল দেখি চোখ, আঁখি... তারপর?'

'চোখ, আঁখি, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, লোচন...'

'গুড, ভালই তো বলেছিস।'

হিমু দা খিদে লেগে গেছে।

'খিদে ব্যাপারটা কেমন ইন্টারেস্টিং দেখেছিস—তোর যত ঝামেলা, যত সমস্যাই থাকুক খিদের সমস্যা সব সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

'ফিলসফি করবে না। ফিলসফি ভাল লাগছে না।'

'খিদের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিস?'

'না।'

'খুব সহজ উপায়। বাহাত্তুর ঘণ্টা কিচ্ছু না খেয়ে থাকা। পানি পর্যন্ত না।

বাহাত্তুর ঘন্টা পর এক চামুচ বা দুচামুচ পানি খাওয়া যেতে পারে। বাহাত্তুর ঘন্টা পার করার পর দেখবি খিদেবোধ নেই—শরীরে ফুরফুরে ভাব। মাথার ভেতরটা অসম্ভব ফাঁকা। মাঝে মাঝে ঝনঝন করে আপনা-আপনি বাজনা বেজে ওঠে। আলোর দিকে তাকালে নানান রঙ দেখা যায়—তিনকোনা কাচের ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন রঙ দেখা যায় তেমন রঙ।'

'তুমি দেখেছ?'

'হুঁ।'

'কতদিন না খেয়ে ছিলে?'

'বাহাত্তুর ঘণ্টা থাকার কথা, বাহাত্তুর ঘণ্টা ছিলাম।'

'বাহাত্তুর ঘণ্টা থাকার কথা তোমাকে কে বলল?'

'বাবা বলেছিলেন। আমার গুরু হচ্ছেন আমার পিতা। মহাপুরুষ বানাবার কারিগর। তোর কী খিদে বেশি লেগেছে?'

'হুঁ।'

'কী খেতে ইচ্ছে করছে?'

'যা খেতে ইচ্ছে করছে তাই খাওয়াবে?'

'আমি কী ম্যাজিসিয়ান নাকী তুই যা খেতে চাইবি—মন্ত্র পড়ে তা-ই এনে দেব?'

'তুমি ম্যাজিসিয়ান তো বটেই। অনেক বড় ম্যাজিসিয়ান। অন্যরা কেউ জানে না, আমি জানি। আমার বাসি পোলাও খেতে ইচ্ছে করছে।'

'বাসি পোলাও মানে?'

'গতরাতে রান্না করা হয়েছে। বেঁচে গেছে, ফ্রীজে রেখে দেয়া হয়েছে। সেই বাসি পোলাওয়ের সঙ্গে গরম গরম ডিমভাজা।'

'খুব উপাদেয় খাবার?'

'উপাদেয় কি না জানি না। একবার খেয়েছিলাম সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে। মাঝে মাঝে আমার এই খাবারটা খেতে ইচ্ছা করে। বাসি পোলাও তো আর চাইলেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি চাইলে পাবে।'

'আমি চাইলে পাব কেন?'

'কারণ তুমি হচ্ছ মহাপুরুষ।'

'মহাপুরুষরা বুঝি চাইলেই বাসি পোলাও পায়?'

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, আয় লাক ট্রাই করতে করতে যাই। রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার ভেতর ঢুকে যাই। সব বাড়ির সামনে দাঁড়াব। কলিং—বেল টিপব—বাড়ির মালিক বের হলে বলব, আমরা একটা সার্ভে করছি। সকালবেলা কোন বাড়িতে কী নাশতা হয় তার সার্ভে। ইনকাম গ্রুপ এবং নাশতার প্রফাইল।'

'কি যে তুমি বল!'

'আরে আয় দেখি।'

'তুমি কী সত্যি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই সিরিয়াস। তবে সার্ভের কথা বলে শুধুহাতে উপস্থিত হওয়া চলবে না। কাগজ লাগবে, বল পয়েন্ট লাগবে। তুই বল পয়েন্ট আর কাগজ কিনে দে।'

'আমার ভয়-ভয় লাগছে হিমু দা।'

'ভয়ের কিছু নেই। আয় তো!'

প্রথম যে বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম সেই বাড়ির নাম উত্তরায়ণ। বেশ জমকালো বাড়ি। গেটে দারোয়ান আছে। গেটের ফাঁক দিয়ে বাড়ির মালিকের দুটো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা গাড়ি মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে কেনা হয়েছে। ঝকঝক করছে।

দারোয়ান বলল, 'কাকে চান?'

আমি বললাম, 'আমরা স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো থেকে এসেছি। বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'আপনার নাম?'

'হিমু।'

'কার্ড দেন।'

'আমার সঙ্গে কার্ড নেই। আমরা ছোট কর্মচারী, আমাদের সঙ্গে তো কাড থাকে না। আপনি ভেতরে গিয়ে খবর দিন। বলবেন স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো।'

দারোয়ান ভেতরে চলে গেল। বাদল বলল, ভয়-ভয় লাগছে হিমু দা। শেষে হয়ত পুলিশে দিয়ে দেবে। মারধোর করবে।

'ভয়ের কিছু নেই।'

'তোমার খালি পা। খালি পা দেখেই সন্দেহ করবে।'

'মানুষ চট করে পায়ের দিকে তাকায় না। তাকায় মুখের দিকে। তাছাড়া আমাদের ভেতরে নিয়ে বসাবে। তখন খালি পায়ে বসলে ভাববে স্যান্ডেল বাইরে খুলে এসেছি।'

'তোমার মারাত্মক বুদ্ধি হিমু দা।'

'তোর মন স্যাঁতসেঁতে ভাবটা কী এখন দূর হয়েছে?'

'হুঁ।'

'একটা উত্তেজনার মধ্যে তোকে ফেলে দিয়েছি যাতে আঁখি মেয়েটির চিন্তা থেকে আপাতত মুক্তি পাস।'

দারোয়ান এসে বলল, যান ভিতরে যাইতে বলছে।

আমরা রওনা হলাম। বাদল ভাল ভয় পেয়েছে। তার চোখেমুখে ঘাম। তবে সে আঁখির হাত থেকে এখন মুক্ত।

আমাদের বসাল ড্রয়িংরুমের পাশে ছোট একটা ঘরে। এটা বোধ হয় গুরুত্বহীন মানুষদের বসার জন্যে ঘর। দেশ থেকে লোক আসবে—এখানে

বসবে। বিল নিতে আসবে, বসবে এই খুপরিতে।

এক ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে ঢুকলেন। বয়স্ক লোক। সকালবেলায় হঠাৎ যন্ত্রণায় তিনি বিরক্ত। বিরক্তি চাপার চেষ্টা করছেন পারছেন না।

'আপনাদের ব্যাপারটা কী?'

'আমি উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোসিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা সমীক্ষা চালাচ্ছি। সমীক্ষাটা হচ্ছে ঢাকা শহরের মানুষদের ব্রেকফাস্টের প্রোফাইল।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, কিসের প্রোফাইল?

'কোন পরিবারে কী ধরনের নাশতা খাওয়া হয় এর উপর একটা জেনারেল স্টাডি। আজ আপনাদের বাসায় কী নাশতা হয়েছে আপনি কী খেয়েছেন?'

'সকালে তো আমি নাশতাই খাই না। একটা টোস্ট খাই আর এক কাপ কফি খাই।'

আমি গম্ভীর মুখে কাগজে লিখলাম—টোস্ট, কফি।

'কফি কী ব্ল্যাক কফি?'

'না, ব্ল্যাক কফি না, দুধ কফি।'

'বাড়িতে নিশ্চয়ই অন্য সবার জন্যে কোন একটা নাশতা তৈরি হয়েছে সেটা কী?'

'দাঁড়ান, আমার ভাগ্নিকে পাঠাই। ও বলতে পারবে। একই জাতীয় স্টাডির কথা প্রথম শুনলাম। যেসব স্টাডি হবার সেসব হচ্ছে না—নাশতা নিয়ে গবেষণা।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে, মেয়েটি ঢুকল সে মীরা। গভীর রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কুড়িয়ে পাওয়া মানিব্যাগ এই মেয়েটির হাতেই দিয়েছি। তবে এমন জমকাল বাড়িতে নয়। মেয়েটি আমাকে চিনতে পারল না। সেও ভদ্রলোকের মতোই বিরক্ত মুখে বলল, আজ এ-বাড়িতে কোনো নাশতা হয় নি। গতরাতে বাড়িতে একটা উৎসব ছিল। বড় মামার পঞ্চাশতম জন্মদিন। সেই উপলক্ষে পোলাও রান্না হয়েছে। অনেক পোলাও বেঁচে গেছে। ডীপ ফ্রীজে রাখা ছিল। সকালে সে-পোলাও গরম করে দেয়া হয়েছে।

আমি সহজ গলায় বললাম, আমরা দুজন কী সেই বাসি পোলাও খেয়ে দেখতে পারি? পোলাওয়ের সঙ্গে ডিমভাজা।

বাদল চোখমুখ শুকনো করে ফেলল। মীরা তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

আমি বললাম, তারপর মীরা, তুমি ভাল আছ?

মীরা এখনো তাকিয়ে আছে।

'আমাকে চিনতে পারছ তো? ঐ যে তোমাকে টাকা দিয়ে এলাম সাঁইত্রিশ হাজার নয়শ একুশ টাকা?'

মীরা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। মেয়েরা হতচকিত অবস্থা থেকে চট করে

উঠে আসতে পারে। মীরা পারছে না। মেয়েটি মনে হয় সহজ-সরল জীবনে বাস করে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তেমন যোগ নেই। তার জীবনে হকচকিয়ে যাবার ঘটনা তেমন ঘটে নি।

'মীরা, আমাকে চিনতে পারছ তো?'

'হুঁ।'

'ভেরি গুড! আমাদের নাশতা দিয়ে দাও খেয়ে চলে যাই। স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা সংগ্রহের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি এসব ধাপ্পাবাজি। আমরা আসলে নাশতা খেতে এসেছি।'

'ও আচ্ছা।'

'আসল কথা বলতে ভুলে গেছি, নাশতা একজনের জন্যে আনবে শুধু বাদলের জন্যে। আমি একবেলা খাই। বাদলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে আমার ফুপাতো ভাই। পিএইচডি. করার জন্যে কোথায় যেন গিয়েছে। জায়গাটা কোথায় রে বাদল?'

বাদল মাথা নিচু করে ছিল। সে মাথা নিচু করে ক্ষীণ স্বরে বলল, কানাডা।

অপরিচিত মানুষের সামনে বাদল একেবারেই সহজ হতে পারে না। মেয়েদের সামনে তো নয়ই। বিশেষ করে মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তাহলে বাদলের জিহ্বা জড়িয়ে যায়। তোতলামি শুরু হয়। রাতে মীরা মেয়েটাকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল দিনে তারচেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে।

ভেতর থেকে ভারী গলায় কে যেন ডাকল—মীরা! মীরা।

মনে হয় শুরুতে যে-ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই ডাকছেন। সকালে কী নাশতা হয় তার তালিকা দিতে মীরার এত দেরি হবার কথা না। মীরা বলল, আপনারা বসুন। আমি আসছি।

বাদল মাথা তুলল। তার কানটান লাল হয়ে আছে। বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে, বিয়ে হলে বাদল তো মনে হয় সারাক্ষণ কান লাল করে বসে থাকত। পার্মানেন্ট তোতলা হয়ে যেত। কেমন আছিসরে বাদল? জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিত—ভা ভা ভা ল।

'হিমু দা!'

'হুঁ।'

'এই মেয়েটাকে তুমি চেন?'

'হুঁ।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কী আছে! সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে পারে না?'

'সেই জন্যে আশ্চর্য বলছি না। অন্য কারণে আশ্চর্য বলছি।'

'কী কারণ?'

'বাসি পোলাও খেতে চেয়েছি—তুমি এই বাড়িতে নিয়ে এলে। এই বাড়িতে

আজই বাসি পোলাও নাশতা।'

'একে বলে কাকতালীয় যোগাযোগ।'

'কাকতলীয় না—এর নাম হিমুতালীয়। তোমার যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তা আমি গোড়া থেকেই জানি— তবে ক্ষমতাটা যে এত প্রবল তা জানতাম না।'

'আমিও জানতাম না।'

'হিমু দা!'

'হুঁ।'

'তুমি কাউকে দেখে তার ভবিষ্যৎ বলতে পার?'

'আমার নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পারি—অন্যেরটা পারি না।'

'তোমার ভবিষ্যৎ কী?'

'বলা যাবে না।'

'হিমু দা!'

'হুঁ।'

'তুমি কী জানতে এ বাড়িতে আজ নাশতা হচ্ছে বাসি পোলাও?'

'জানতাম না।'

মীরা ঢুকেছে। তার হাতে ট্রে। ট্রেভরতি খাবার। মীরার পেছনে একটা কাজের মেয়ে—তার হাতেও ট্রে। শুধু যে বাসি পোলাও এসেছে তা না, পরোটা এসেছে, গোশত এসেছে। ছোট ছোট গ্লাসে কমলার রস। মীরা বলল, আপনারা চা খাবেন, না কফি খাবেন?

আমি বাদলকে বললাম, 'কী খাবি বল?'

'বাদল বলল, ক ক কফি।'

বাদলকে তোতলামীতে ধরে ফেলেছে।

মীরা আমার সামনে বসল। তার বসার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে নিজেকে তৈরি করে এনেছে। কি কি বলবে সব ঠিক করা। নাশতা নিয়ে ঢোকার আগে সে নিশ্চয়ই মনে মনে রিহার্সেল দিয়েও এসেছে। মীরা বলল, আপনার নাম হিমু? উনি হিমু দা বলে ডাকছিলেন।'

'আমার নাম হিমু।'

'ঐ রাতে আপনাকে ধন্যবাদ দেয়া হয় নি। আসলে আমি আর বাবা আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম টাকাটা কখনো পাওয়া যাবে না। বাবা অবিশ্যি বার বারই বলছিলেন টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে। তবে এটা ছিল নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কথার কথা। আপনি যখন সত্যি সত্যি মানিব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন আমরা এতই হতভম্ব হয়ে গেলাম যে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আপনি যেমন হুট করে উপস্থিত হলেন তেমনি হুট করেই চলেও গেলেন। তখন বাবা খুব হৈচৈ শুরু করলেন, মানুষটা গেল কোথায় মানুষটা গেল কোথায়? বাবা খুব অল্পতে অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তাঁর ব্লাড প্রেসারও বেড়ে

যায়। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। আপনাদের খুঁজে বের করার জন্যে রাত আড়াইটার সময় ঘর থেকে বের হলেন।'

'বল কী!'

'আমার বাবা খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সঙ্গে কথা না বললে বুঝতে পারবেন না। উনি রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আপনাদের খুঁজে বেড়ালেন। আমি একা একা ভয়ে অস্থির।'

'একা কেন?'

'একা, কারণ আমাদের সংসারে দুজনই মানুষ। আমি আর আমার বাবা। যাই হোক বাবা বাসায় ফিরেই বললেন, মীরা শোন, আমি নিশ্চিত টাকা নিয়ে যারা এসেছিল তারা মানুষ না, অন্য কিছু।'

আমি বললাম, অন্য কিছু মানে?

বাবা বললেন, অন্য কিছুটা কী আমি নিজেও জানি না। আমাদের দৃশ্যমান জগতে মানুষ যেমন বাস করে, মানুষ ছাড়া অন্য জীবরাও বাস করে। তাঁদের কেউ এসেছিলেন। বাবা এমনভাবে বললেন, যে আমি নিজেও প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। সেই কারণেই আপনাকে দেখে এমন চমকে উঠেছিলাম।

'ও আচ্ছা।'

'এখন আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে বাবার সঙ্গে দেখা করুন। বাবার মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। আজ কী যেতে পারবেন?'

'বুঝতে পারছি না। আজ আমাদের অনেক কাজ।'

'কী কাজ?'

'বাঁদর দেখার জন্যে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। হাতীর পিঠে চড়তে। এ জার্নি বাই এলেফেন্ট টাইপ ব্যাপার। আঁখি নামের একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'বেশ, কাল আসুন।'

'দেখি পারি কী না।'

'আপনি আমার বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। একটা ভুল ধারণা তাঁর মনে ঢুকে গেছে। এটা বের করা উচিত।'

'আমি হাসিমুখে বললাম, কোনটা ভুল ধারণা, কোনটা শুদ্ধ ধারণা সেটা চট করে বলাও কিন্তু মুশকিল। এই পৃথিবীতে সবকিছুই আপেক্ষিক।'

'আপনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন না যে আপনি মানুষ না, অন্য কিছু।'

আমি আবারও হাসলাম। আমার সেই বিখ্যাত বিভ্রান্ত করা হাসি। তবে বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অনেক চালাক যত বিভ্রান্তির হাসিই কেউ হাসুক মেয়েরা বিভ্রান্ত হয় না। তা ছাড়া পরিবেশের একটা ব্যাপারও আছে। বিভ্রান্ত হবার জন্যে

পরিবেশও লাগে। আমি যদি রাত দু'টায় হঠাৎ করে মীরাদের বাসায় উপস্থিত হই এবং এই কথাগুলি বলি— কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সে বিভ্রান্ত হবে।

এখন ঝলমলে দিনের আলো। আমাদের নাশতা দেয়া হয়েছে। কফি পট ভরতি। কফির পট থেকে গরম ধোয়া উড়ছে। এই সময় বিভ্রান্তি থাকে না।

বাদল মাথা নিচু করে বাসি পোলাও খাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাসি পোলাও-এর মতো বেহেশতি খানা সে এই জীবনে প্রথম খাচ্ছে।

আমরা চিড়িয়াখানায় গেলাম।

বাঁদরদের বাদাম খাওয়ালাম। তাদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি দেখলাম। তারপর হাতীর পিঠে চড়লাম। দশ টাকা করে টিকিট। তারপর গেলাম শিম্পাঞ্জি দেখতে। শিম্পাঞ্জী দেখে তেমন মজা পাওয়া গেল না। কারণ তার অবস্থা বাদলের মত। খুবই বিমর্ষ। আমরা একটা কলা ছুঁড়ে দিলাম—সে ফিরেও তাকাল না। বাঁদর গোত্রীয় প্রাণী— অথচ কলার প্রতি আগ্রহ নেই— এই প্রথম দেখলাম। বাদলকে বললাম, চল জিরাফ দেখি।

বাদল শুকনো গলায় বলল, জিরাফ দেখে কি হবে।

'জিরাফের লম্বা গলা দেখে যদি তোর মনটা ভাল হয়।'

'আমার মন ভাল হবে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব।'

'যা চলে যা। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সন্ধ্যাবেলা সব পশুপাখি একসঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করে— ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার।'

'কোন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমি এখন আর আগ্রহ বোধ করছি না।'

'তাহলে যা, বাড়িতে গিয়ে লম্বা ঘুম দে।'

'তুমি আঁখিকে টেলিফোন করবে না?'

'করব।'

'এখন কর। চিড়িয়াখানায় কার্ড ফোন আছে। আমার কাছে কার্ড আছে।'

'তুই কি ফোন কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এ পর্যন্ত ঐ বাড়িতে ক'বার টেলিফোন করেছিস?'

'দু'বার।'

'তোর সঙ্গে কথা বলেনি?'

'না।'

'তোর সঙ্গেই কথা বলেনি আমার সঙ্গে কি আর বলবে?'

'তোমার সঙ্গে বলবে— কারণ তুমি হচ্ছ হিমু।'

'টেলিফোন করে কি বলব?'

বাদল চুপ করে রইল। আমি হাসি মুখে বললাম, তুই নিশ্চয়ই চাস না— কেমন আছ, ভাল আছি টাইপ কথা বলে রিসিভার রেখে দি। মেয়েটাকে আমি কি বলব সেটা বলে দে।

'তোমার যা ইচ্ছা তাই বল।'

'আমি কি বলব— আঁখি শোন, মগবাজার কাজি অফিস চেন? এক কাজ কর— রিকশা করে কাজি অফিসে চলে আস। আমি বাদলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এলে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব। কোন সমস্যা নেই।'

বাদল মাথা নীচু করে ফেলল। মনে হচ্ছে সে খুবই লজ্জা পাচ্ছে। প্রায় ফিস ফিস করে বলল, তুমি আসতে বললে আঁখি চলে আসবে।

'তোর তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

তুই কিন্তু ভালই বোকা।'

'আমি বোকা হই যাই হই তুমি হচ্ছ হিমু। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

'আচ্ছা পরীক্ষা হয়ে যাক— আমি আঁখিকে আসতে বলি। বলব?'

বাদল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, বল।

বেশ কয়েকবার টেলিফোন করা হল। ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরছে না। বাদল শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাদলকে দেখে খুবই মায়া লাগছে। মায়া লাগলেও কিছু করার নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে প্রতি পদে পদে মায়াকে তুচ্ছ করতে হয়।

কোনো ভদ্রলোকের যদি বিয়ের দু'বছরের মাথায় সন্তানপ্রসব জনিত জটিলতায় স্ত্রীবিয়োগ হয়, তিনি যদি আর বিয়ে না করেন এবং বাকি জীবন কাটিয়ে দেন সন্তানকে বড় করার জটিল কাজে তখন তাঁর ভেতর নানান সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার মূল কারণ অপরাধবোধ। স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী করেন। সন্তানের জন্ম না হলে স্ত্রী মারা যেত না। সন্তানের জন্মের জন্যে তাঁর ভূমিকা আছে এই তথ্য তাঁর মাথায় ঢুকে যায়। মাতৃহারা সন্তানকে মাতৃস্নেহবঞ্চিত করার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তাঁর নিজের নিঃসঙ্গতার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তিনি সংসারে বেঁচে থাকেন অপরাধীর মতো। যতই দিন যায় তাঁর আচার, আচরণ জীবনযাপন পদ্ধতি ততই অসংলগ্ন হতে থাকে। স্ত্রী জীবিত অবস্থায় তাকে যতটা ভালবাসতেন, মৃত্যুর পর তারচে অনেক বেশী ভালবাসতে শুরু করেন। সেই ভালবাসাটা চলে যায় অসুস্থ পর্যায়।

আশরাফুজ্জামান সাহেবকে দেখে আমার তাই মনে হল। মীরার বাবার নাম আশরাফুজ্জামান। একসময় কলেজের শিক্ষক ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দেন। এটাই স্বাভাবিক। অস্থিরতায় আক্রান্ত একটা মানুষ স্থায়ীভাবে কিছু করতে পারে না। বাকি জীবনে তিনি অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছেন—ইনসিউরেন্স কোম্পানির কাজ, ট্র্যাভিলিং এজেন্সির চাকরি থেকে ইনডেনটিং ব্যবসা, টুকটাক ব্যবসা সবই করা হয়েছে। এখন কিছু করছেন না। পৈত্রিক বাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালাচ্ছেন। সংসারে দুটিমাত্র মানুষ থাকায় তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। ভদ্রলোকের প্রচুর অবসর। এই অবসরের সবটাই কাটাচ্ছেন মৃত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি উদ্ভাবনে। ভদ্রলোক খুব রোগা। বড় বড় চোখ। চোখের দৃষ্টিতে ভরসা-হারানো ভাব। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে মাথায় কাঁচাপাকা চুল থাকার কথা। তাঁর মাথার সব চুলই পাকা। ধবধবে শাদা চুলে ভদ্রলোকের মধ্যে ঋষি ঋষি ভাব চলে এসেছে। তাঁর গলার স্বর খুব মিষ্টি। কথা বলার সময় একটু ঝুঁকে কাছে আসেন। তাঁর হাত খুবই সরু। মৃত মানুষের হাতের মত- বিবর্ণ। কথা বলার সময় গায়ে হাত দেয়ার অভ্যাসও তাঁর আছে। তিনি যতবারই গায়ে হাত দিয়েছেন, আমি ততবারই চমকে উঠেছি।

'আপনার নাম হিমু?'

'জ্বি।'

'মানিব্যাগ নিয়ে রাতে আপনি যখন এসেছিলেন তখন আপনার চেহারা একরকম ছিল—এখন অন্য রকম।'

আমি বললাম, তাজমহল দিনের একেক আলোয় একেক রকম দেখা যায়—মানুষ তো তাজমহলের চেয়েও অনেক উন্নত শিল্পকর্ম মানুষের চেহারাও বদলানোর কথা।

'আমার ধারণা ছিল আপনি মানুষ না।'

'এখন কী ধারণা আমি মানুষ?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখেমুখে এক ধরনের অস্বস্তি। মনে হচ্ছে তিনি আমার ব্যাপারে এখন সংশয়মুক্ত না। আমি হাসিমুখে বললাম, একদিন দিনের বেলা এসে আপনাকে দেখাব—রোদে দাঁড়ালে আমার ছায়া পড়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেব নীচু গলায় বললেন, মানুষ না, কিন্তু মানুষের মতো জীবদেরও ছায়া পড়ে।

'তাই নাকি?'

'জ্বি। এরা মানুষদের মধ্যেই বাস করে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি অনেক কিছু জানি, কিন্তু কাউকে মন খুলে বলতে পারি না। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। পাগল ভাববে। মীরাকেও আমি তেমন কিছু বলি না।'

'আমাকে বলতে চাচ্ছেন?'

'জ্বি না।'

'বলতে চাইলে বলতে পারেন।'

'আচ্ছা, আমাকে দেখে কী আপনার মনে হয় আমি অসুস্থ?'

'না, তা মনে হচ্ছে না।'

'মীরার ধারণা আমি অসুস্থ। যতই দিন যাচ্ছে ততই তার ধারণা প্রবল হচ্ছে। অথচ আমি জানি আমি খুবই সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। আমার অস্বাভাবিকতা বলতে এইটুকু যে মীরার মা'র সঙ্গে আমার দেখা হয়, কথাবার্তা হয়।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি। মানিব্যাগ হারিয়ে গেল। আমি খুবই আপসেট হয়ে বাসায় এসেছি। আমি মোটামুটি ভাবে দরিদ্র মানুষ—এতগুলি টাকা। মীরাকে খবরটা দিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছি—তখন মীরার মা'র সঙ্গে আমার কথা হল। সে বলল, তুমি মন-খারাপ কোরো না টাকা আজ রাতেই ফেরত পাবে। আমি মীরাকে বললাম, সে হেসেই উড়িয়ে দিল।'

'হেসে উড়িয়ে দেয়াটা ঠিক হয় নি। টাকাতো সেই রাতেই ফিরত পেয়েছিলেন। তাই না?'

'জ্বি। মীরার মা সারাজীবন আমাকে নানানভাবে সাহায্য করেছে। এখন করছে।'

'উনার নাম কী?'

'ইয়াসমিন।'

'উনি কী সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলেন না প্ল্যানচেটের মাধ্যমে তাঁকে আনতে হয়।'

তিনি নীচু গলায় বললেন, শুরুতে প্ল্যানচেট করে আনতাম। এখন নিজেই আসে। যা বলার সরাসরি বলে।

'তাকে চোখে দেখতে পান?'

'সব সময় পাই না—হঠাৎ হঠাৎ দেখা পাই। আপনি বোধহয় আমার কোনো কথা বিশ্বাস করছেন না। অবিশ্বাসের একটা হাসি আপনার ঠোঁটে।'

'আমি আপনার সব কথাই বিশ্বাস করছি। আমি তো মিসির আলি না যে সব কথা অবিশ্বাস করব। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুর মূলমন্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

'মিসির আলি কে?'

'আছেন একজন। তাঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে তর্কে মিলায় বস্তু, বিশ্বাসে বহুদূর। তাঁর ধারণা জীবনটা অঙ্কের মতো। একের সঙ্গে এক যোগ করলে সব সময় দুই হবে। কখনো তিন হবে না।'

'তিন কী হয়?'

'অবশ্যই হয়—আপনার বেলায় তো হয়ে গেল। আপনি এবং মীরা—এক এক দুই হবার কথা। আপনার বেলায় হচ্ছে তিন। মীরার মা কোত্থেকে যেন উপস্থিত হচ্ছেন।'

'আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। চা খাবেন?'

'চা কে বানাবে, মীরা তো বাসায় নেই।'

'চা আমিই বানাব। ঘর সংসারের কাজ সব আমিই করি। চা বানানো, রান্না—সব করতে পারি। মোগলাই ডিশও পারি।'

'আপনার কোনো কাজের লোক নেই?'

'না।'

'নেই কেন? মীরার মা পছন্দ করেন না?'

'জ্বি না। আপনি ঠিক ধরেছেন।'

'কোনো কাজের মানুষের সাহায্য ছাড়া মেয়েকে বড় করতে আপনার কোনো সমস্যা হয় নি।'

'সমস্যা তো হয়েছেই। তবে ইয়াসমিন আমাকে সাহায্য করেছে। যেমন

ধরুন মেয়ে রাতে কাঁথা ভিজিয়ে ফেলেছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, ঘুমে অচেতন। ইয়াসমিন আমাকে ডেকে তুলে বলবে—মেয়ে ভেজা কাঁথায় শুয়ে আছে।'

'বাহ ভাল তো।'

'মীরার একবার খুব অসুখ হল। কিছু খেতে পারে না, যা খায় বমি করে ফেলে দেয়—শরীরে প্রবল জ্বর। ডাক্তাররা কড় কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন জ্বর সারছে না। তখন ইয়াসমিন এসে বলল, তুমি মেয়েকে অষুধ খাওয়ানো বন্ধ করো। কাগজিলেবুর সরবত ছাড়া কিছু খাওয়াবে না।'

'আপনি তা-ই করলেন?'

'প্রথম দিকে করতে চাই নি। ভরসা পাচ্ছিলাম না—কারণ মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ। তাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। এরকম একজন রোগীর অষুধপত্র বন্ধ করে দেয়াটা কঠিন কাজ।'

'অর্থাৎ আপনি আপনার স্ত্রীর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন নি।'

'জ্বি করেছি, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। মেয়ের অবস্থা আরও যখন খারাপ হল তখন প্রায় মরিয়া হয়েই অষুধপত্র বন্ধ করে লেবুর সরবত খাওয়াতে শুরু করলাম। দু'দিনের মাথায় মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল।'

'এরকম ভূত-ডাক্তার ঘরে থাকাটাতো খুব ভাল।'

'দয়া করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে কোনো রসিকতা করবেন না। আমি এম্নিতেই রসিকতা পছন্দ করি না। স্ত্রীকে নিয়ে রসিকতা একেবারেই পছন্দ করি না। চা খাবেন কি-না তা তো বলেন নি।'

'চা খাব।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চা আনতে গেলেন। সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। পুরো রাত আমার সামনে পড়ে আছে। আশরাফুজ্জামান সাহেব চা বানাতে থাকুন আর আমি বসে বসে গুছিয়ে ফেলি রাতে কি কি করব। অনেকগুলি কাজ জমে আছে।

ক) আঁখি নামের মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি। যোগাযোগ করতে হবে। টেলিফোন করলেই ও পাশ থেকে পোঁ পোঁ শব্দ হয়। বাদল কি টেলিফোন নাম্বার ভুল এনেছে?

খ) মেজো ফুপু জরুরি খবর পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় আঁখি-সংক্রান্ত বিষয়েই আলাপ করতে চান।

গ) এক পীরের সন্ধান পাওয়া গেছে—নাম ময়লা বাবা। সারা গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন। তার সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।

ঘ) মিসির আলি সাহেবের ঠিকানা পাওয়া গেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা। উনি কথা বলবেন কি না কে জানে! যুক্তিসংগত কারণ উপস্থিত না করলে উনি কথা বলবেন বলে মনে হয় না। এই ধরনের মানুষরা যুক্তির বাইরে

পা দেন না। তাঁরা জানেন অ্যান্টিলজিক হচ্ছে লজিকেরই উলটো পিঠ।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি!'

'আপনার চা নিন। চায়ে আপনি ক'চামুচ চিনি খান?'

'যে যত চামুচ দেয় তত চামুচই খাই। আমার কোনোকিছুতেই কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই।'

'আমি এক চামচ চিনি দিয়েছি।'

'খুব ভাল করেছেন। এবং চা অসাধারণ হয়েছে—গরম মসল্লা দিয়েছেন নাকি?'

'সামান্য দিয়েছি—এক দানা এলাচ, এক চিমটি জাফরান। ফ্লেবারের জন্যে দেয়া।'

'খুব ভাল করেছেন।'

'আমার স্ত্রী চা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করত। কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে রেখে দিত। মাঝে মাঝে চায়ে সামান্য কমলালেবুর খোসা দিয়ে দিত। অসাধারণ টেস্ট। কমলালেবুর শুকানো খোসা আমার কাছে আছে, একদিন আপনাকে খাওয়াব।'

'জ্বি আচ্ছা। একটা কথা আপনার স্ত্রী কী এই বাড়িতেই থাকেন, মানে ভূত হবার পর আপনার সঙ্গেই আছেন?'

'ইয়াসমিন প্রসঙ্গে ভূত প্রেত এই জাতীয় শব্দ দয়া করে ব্যবহার করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা, করব না। উনি কী এখন আশেপাশেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর উপস্থিতি আপনি বুঝতে পারেন?'

'পারি।'

'আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আপনি কথা বললে সে শুনবে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে কি-না তাতো জানি না। সে মীরার সঙ্গেই কথা বলে না। মীরা তার নিজের মেয়ে।'

'আমি আপনার স্ত্রীকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কি ভাবে বলব? বাতি নিভিয়ে বলতে হবে?'

'বাতি নিভাতে হবে না। যা বলার বলুন, সে শুনবে।'

'সম্বোধন করব কি বলে? ভাবী ডাকব?'

'হিমু সাহেব! আপনি পুরো ব্যাপারটা খুব হালকা ভাবে নেবার চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক না। আমার স্ত্রীকে আপনার যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি তার কাছ থেকে জবাব এনে দিচ্ছে।'

'চা শেষ করে নি। চা খেতে খেতে যদি উনার সঙ্গে কথা বলি – উনি হয়ত

এটাকে বেয়াদবী হিসেবে নেবেন।'

'আবারো রসিকতা করছেন?'

'আর করব না।'

আমি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম— আমার ভাল নাম হিমালয়। ডাকনাম হিমু। সবাই এখন আমাকে এই নামে চেনে। আমাকে বলা হয়েছে মীরার মৃতা মা এই বাড়িতে উপস্থিত আছেন। আমি এর আগে কোন মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলিনি। আমি জানি না তাদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়। আমার কথা বার্তায় যদি কোন বেয়াদবী প্রকাশ পায়— দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আমি আপনার কাছ থেকে একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি। আমি এক রাতে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। কি দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা কি আপনি বলতে পারবেন?

কথা শেষ করে মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে রইলাম। আশরাফুজ্জামান সাহেবও চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমন্ত মানুষের মত তিনি ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলছেন। তাঁর ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য আমি শব্দ করে কাশলাম। তিনি চোখ মেললেন না, তবে নড়ে চড়ে বসলেন। আমি বললাম,

'উনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?'

'পেয়েছে।'

'উত্তরে কি বললেন?'

'সে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চায় না।'

আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। মীরাকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

'আরেকটু বসুন, মীরা চলে আসবে। তার বান্ধবীর জন্মদিনে গিয়েছে। বলে গেছে আটটার মধ্যে চলে আসবে। আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আজ মীরা আসতে অনেক দেরী করবে। বারোটা একটা বেজে যেতে পারে। কাজেই অপেক্ষা করা অর্থহীন।

আশরাফুজ্জামান সাহেব ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, দেরি করবে বলছেন কেন?

''আমার মনে হচ্ছে দেরি হবে। এক ধরনের ইনটিউশন। আমার ইনটিউশন ক্ষমতা প্রবল।'

'ভদ্রলোক অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনি ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনি যা বলেছেন আমি বিশ্বাস করেছি। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন?'

'মীরা কখনো রাত আটটার পর বাইরে থাকে না। আমার এখানে টেলিফোন নেই। দেরি হলে টেলিফোনে খবর দিয়ে সে আমার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারবেনা বলেই কখনো দেরি করবে না। আপনি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন।

কমলালেবুর খোসা দিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দি খেয়ে দেখুন।'

'অন্য সময় এসে খেয়ে যাব। আমার খুব কিছু জরুরি কাজ আছে আজ রাতের মধ্যেই সারতে হবে।'

আমি রাস্তায় নামলাম।

প্রথমে যাব মেজো ফুপুর কাছে। ছেলের বিয়েভাঙার শোক তিনি সামলে উঠেছেন কি না কে জানে, মেয়ের বিয়েভাঙ্গার শোক সামলানো যায় না। ছেলের বিয়েভাঙ্গার শোক ক্ষণস্থায়ী হয়। এইসব ক্ষেত্রে ছেলের মা একটু বোধ হয় খুশিও হন—ছেলে আর কিছু দিন রইল তাঁর ডানার নিচে। ছেলের বিয়ে নিয়ে এত ভাবারও কিছু নেই। মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। ছেলেদের বিয়ের বয়স পার হয় না।

মেজো ফুপু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার নিচে রাবার ক্লথ। তাঁর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। বিভ্রান্ত হবার মতো কোনো দৃশ্য না। যারা মেজো ফুপুর সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন, মাথায় পানি ঢালা তার হবি বিশেষ। তিনি খুব আপসেট, মাথায় পানি ঢেলে তাঁকে ঠিক করা হচ্ছে এটা তিনি মাঝে-মধ্যেই প্রমাণ করতে চান। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম, ফুপু কী খবর?

ফুপু ক্ষীণ স্বরে বললেন, কে?

এটাও তার অভিনয়ের একটা অংশ। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে তাঁর অবস্থা এতই খারাপ যে তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না।

'মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে, ব্যাপার কী ফুপু?'

'তুই কিছু জানিস না? আমাদের সবার তো কাপড় খুলে নেংটো করে ছেড়ে দিয়েছে!'

'কে?'

'বাদলের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। রাত এগারোটা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে মেয়ে দেয় নি।'

'ও এই ব্যাপার।'

মেজো ফুপু ঝপাং করে উঠে বসলেন। যে পানি ঢালছিল তার হাতের এইম নষ্ট হওয়ায় পানি চারদিকে ছড়িয়ে গেল। মেজো ফুপু হুংকার দিয়ে বললেন, এটা সামান্য ব্যাপার? তোর কাছে এটা সামান্য ব্যাপার?

'ব্যাপার খুবই গুরুতর। মেয়ে মা'র সঙ্গে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে, এখন করা যাবে কী? আজকালকার মেয়ে, এরা কথায়-কথায় মা'দের সঙ্গে রাগ করে।'

'মেয়ে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে এই গাঁজাখুড়ি গল্প তুই বিশ্বাস করতে বলিস? তুই ঘাস খাস বলে আমিও ঘাস খাই! মেয়েকে ওরাই লুকিয়ে রেখেছে।'

'তাই নাকি?'

'অবশ্যই তাই।'

'শুধু শুধু লুকিয়ে রাখবে কেন?'

'সেটা তুই জেনে দে।'

'আমি কীভাবে জানব?'

'তুই ওদের বাসায় যাবি। মেয়ের সঙ্গে কথা বলবি, ব্যাপার কী সব জেনে আসবি। মেয়ের বাবাকে বলবি ঝেড়ে কাশতে। আমি সব জানতে চাই।'

'জেনে লাভ কী?'

'লাভ আছে। আমি ওদের এমন শিক্ষা দেব যে তিন জন্মে ভুলবে না।'

'শিক্ষা দিয়ে কী হবে, তুমি তো আর স্কুল খুলে বসোনি।'

'তোর গা-জ্বালা কথা আমার সঙ্গে বলবি না। তোকে যা করতে বলছি করবি। এক্ষুণি চলে যা।'

'ওদের গোপন কথা ওরা আমাকেই বা শুধুশুধু বলবে কেন?'

'তুই ভুজুং ভাজুং দিয়ে মানুষকে ভুলাতে পারিস। ওদের কাছ থেকে খবর বের করে আন তারপর দেখ আমি কী করি।'

'করবেটা কী?'

'মানহানির মামলা করব। আমি সাদেককে বলে দিয়েছি—এর মধ্যে মনে হয় করা হয়েও গেছে। মেয়ের বাপ আর মামাটাকে জেলে ঢুকাব। তার আগে আমার সামনে এসে দুজনে দাঁড়াবে। কানে ধরে দশবার উঠবোস করবে।'

'তোমার বেয়াই তোমার সামনে কানে ধরে উঠবোস করবে এটা কী ঠিক হবে? বিবাহ সম্পর্কিত আত্মীয় অনেক বড় আত্মীয়।'

'তারা আমার আত্মীয় হল কখন?'

'হয় নি, হবে।'

'হিমু, তুই কী আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?'

'না, ফাজলামি করছি না—কোনো একটা সমস্যায় বিয়ে হয় নি, সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বিয়ে হতে আপত্তি কী? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'বাদলের মন ঐ মেয়ের কাছে পড়ে আছে।'

'বাদলের মন ঐ মেয়ের কাছে, কী বলছিস তুই! যে-মেয়ে লাথি দিয়ে তাকে নর্দমায় ফেলে দিল, যে তাকে নেংটো করে দিল এত মানুষের সামনে তার কাছে—'

'যা পাওয়া যায় না তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।'

'বাদল যদি কোনদিন ঐ মেয়ের নাম মুখে আনে তাকে আমি জুতাপেটা করব। জুতিয়ে আমি তার রস নামিয়ে দেব।'

'জুতাপেটা করেও লাভ হবে না ফুপু। আমি বরং দেখি জোড়াতালি দিয়ে

কিছু করা যায় কি না। বাদল আঁখির টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে—যোগাযোগ করে দেখি।'

'বাদল তোকে ঐ মেয়ের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'দুধ কলা দিয়ে আমি তো দেখি কালসাপ পুষেছি।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। যে মেয়ে তোমাদের সবাইকে নেংটো করে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছে তার জন্যে এত ব্যাকুলতা। তার টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ছোটাছুটি।'

মেজো ফুপুর রাগ চরমে উঠে গিয়েছিল। তিনি বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে রাগ সামলালেন। থমথমে গলায় বললেন, হিমু শোন। বাদল যদি ঐ মেয়ের কথা মুখে আনে তাকে আমরা ত্যাজ্যপুত্র করব। এই কথাটা তাকে তুই বলবি।

'এক্ষুণি বলছি।'

'বাদল বাসায় নেই, কোথায় যেন গেছে। তুই বসে থাক। বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাবি না।'

'আচ্ছা যাব না। বাদল গেছে কোথায়?'

'জানি না।'

'আঁখিদের বাসায় চলে যায়নি তো?'

মেজো ফুপু রক্তচক্ষু করে তাকাচ্ছে। এইবার বোধ হয় তাঁর ব্লাডপ্রেশার সত্যি সত্যি চড়েছে। অকারণে মানুষের চোখ এমন লাল হয় না।

'ফুপু তুমি শুয়ে থাক্। তোমার মাথায় পানিটানি দেয়া হোক। আমি বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাচ্ছি না। ফুপা কোথায়?'

'আর কোথায়, ছাদে।'

আমি ছাদের দিকে রওনা হলাম। আজ বুধবার—ফুপার মধ্যপান দিবস। তাঁর ছাদে থাকারই কথা। ফুপু ওয়াল ক্লথে মাথা রেখে আবার শুয়েছেন। কিপুল উৎসাহে তাঁর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।

ফুপা ছাদেই আছেন।

তাঁকে যেন আনন্দিত বলেই মনে হল। জিনিস মনে হয় পেটে পড়েছে। এবং ভাল ডোজেই পরেছে। তাঁর চোখে মুখে উদাস এবং শান্তি শান্তি ভাব।

'কে, হিমু?'

'জ্বি।'

'আছ কেমন হিমু?'

'জ্বি ভাল।'

'কেমন ভাল—বেশি, কম, না মিডিয়াম?'

'মিডিয়াম।'

'আমার মনটা খুবই খারাপ হিমু।'

'কেন?'

'বাদলের বিয়েতে তো তুমি যাও নি। বিরাট অপমানের হাত থেকে বেঁচে গেছ। তারা বিয়ে দেয় নি। মেয়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে।'

'বলেন কী?'

'বানোয়াট গল্প ফেঁদেছে। মেয়ে নাকি রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? যার বিয়ে সে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি যাবে।'

'আজকালকার ছেলেমেয়ে, এদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না।'

'এটা তুমি অবিশ্যি ঠিক বলেছ। আমাদের সময় আর বর্তমান সময় এক না। সোসাইটি চেঞ্জ হচ্ছে। ঘরে ঘরে এখন ভিসিআর, ডিস অ্যান্টেনা। এইসব দেখেশুনে ইয়াং ছেলেমেয়েরা নানান ধরনের ড্রামা করা শিখে যাচ্ছে। বিয়ের দিন রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে যাওয়া সেই ড্রামারই একটা অংশ। ভাল বলেছ হিমু। well said. এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা আসলেই রাগ করে বান্ধবীর বাড়িতে গেছে।'

'ছেলের বিয়ে হয় নি বলে আপনারা লজ্জার মধ্যে পরেছেন। ওদের লজ্জাতো আরও বেশি। মেয়ের বিয়ে হল না।'

'অবশ্যই অবশ্যই। ভাগ্যিস মুসলমান পরিবারের মেয়ে। হিন্দু মেয়ে হলে তো দুপড়া হয়ে যেত। এই মেয়ের আর বিয়েই হত না। হিমু ছেলেরা হচ্ছে হাঁসের মত গায়ে পানি লাগে না। আর মেয়েরা হচ্ছে মুরগির মতো এককোটা পানিও ওদের গায়ে লেপ্টে যায়। আঁখি মেয়েটার জন্যে খুবই মায়া হচ্ছে হিমু।'

'মায়া হওয়াই স্বাভাবিক।'

'ঐ দিন অবিশ্যি খুবই রাগ করেছিলাম। ভেবেছিলাম মানহানির মামলা করব।'

'আপনার মতো মানুষ মানহানির মামলা কীভাবে করে! আপনি তো গ্রামের মামলাবাজ মোড়ল না। আপনি হচ্ছেন হৃদয়বান একজন মানুষ।'

'ভাল কথা বলেছ হিমু। হৃদয়বান কথাটা খুব খাঁটি বলেছ। গাড়ি করে যখন আমি শেরাটন হোটেলের কাছে ফুলওয়ালি মেয়েগুলি ফুল নিয়ে আসে ধমক দিতে পারি না। কিনে ফেলি। ফুল নিয়ে আমি করব কী বললো। তোমার ফুপুকে যদি দিই সে রেগে যাবে, ভাববে আমার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে। কাজেই নর্দমায় ফেলে দি।'

'একবার তোমার ফুপুকে ফুল দিয়েছিলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল- ঢং কর কেন?'

'তাই না-কি?'

'এইসব দুঃখের কথা বলে কি হবে। বাদ দাও।'

'জ্বি আচ্ছা বাদ দিচ্ছি।'

তোমার দুই বন্ধু এখনও আসছে না কেন বল তো?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ওদের কী আসার কথা নাকি?

'আসার কথা তো বটেই। ওদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে। প্রতিবুধবারে আসতে বলেছি। ভেরি গুড কোম্পানি। ওরা যে আমাকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করে সেটা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'ফুপু বলছিলেন ওরা নাকি নেংটা হয়ে ছাদে নাচানাচি করছিল।'

ফুপা গ্লাসে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, তোমার ফুপু বিন্দুতে সিন্ধু দেখে। কাশির শব্দ শুনে ভাবে যক্ষা। ঐ রাতে কিছুই হয় নি। বেচারাদের গরম লাগছিল—আমি বললাম, শার্ট খুলে ফেলো। গরমে কষ্ট করার মানে কী। ওরা শার্ট খুলেছে। আমিও খুলেছি ব্যস!'

'ও আচ্ছা।'

'হিমু, তোমার বন্ধু দু'জন দেরি করছে কেন? এইসব জিনিস একা একা খাওয়া যায় না। খেতে খেতে মন খুলে কথা না বললে ভাল লাগে না। দুধ একা খাওয়া যায়, কিন্তু ড্রিংকসে বন্ধু বান্ধব লাগে।'

'আসতে যখন বলেছেন অবশ্যই আসবে।'

'তুমি বরং এক কাজ করো ঘরের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো। ওরা হয়তো বাসার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বাসা চিনতে পারছে না বলে ঢুকতে পারছে না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে নিয়ে আসবে। তোমার ফুপুর জানার দরকার নেই। দুটো নিতান্তই গোবেচারা ভদ্র ছেলে—অথচ তোমার ফুপু ওদের বিষ দৃষ্টিতে দেখছে। I don't know why? শাস্ত্রে বলে না নারীচরিত্র দেবা না জানন্তি কুত্রাপি মনুষ্য ঐ ব্যাপার আর কী? হিমু—Young friend রাস্তায় গিয়ে ওদের জন্যে একটু দাঁড়াও।

'জ্বি আচ্ছা।'

আমি নিচে নেমে দেখি ফুপুর মাথায় পানি ঢালাঢালি শেষ হয়েছে। তিনি গম্ভীর মুখে বসার ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে তাঁর চেয়েও তিন ডাবল গম্ভীর মুখে অন্য একজন বসে আছে। আমি দরজা খুলে রাস্তায় চুপিচুপি নেমে যাব ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, এই হিমু শুনে যা। আমি পরিচয় করিয়ে দি এ হচ্ছে সাদেক। হাইকোর্টে প্রাকটিস করে। আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়। ভয়ংকর কাজের ছেলে। মানহানির মামলা ঠুকতে বলেছিলাম, এখন মামলা সাজিয়েছে। কাল মামলা দায়ের করা হবে তারপর দেখবি কত গমে কত আটা। সাদেক, তুমি হিমুকে মামলার ব্যাপারটা বলো।

সাদেক বিরক্ত মুখে বললেন, উনাকে শুনিয়ে কী হবে?

'আহা শোনাও না! হিমু আমাদের নিজেদের লোক। মামলাটা কী সাজানো হয়েছে সে শুনুক, কোন সাজেশান থাকলে দিক। এই হিমু, বসে ভাল করে শোন। সাদেক তুমি গুছিয়ে বলো।'

'সাদেক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, শুধু মানহানি মামলা তো তেমন জোরালো হয় না। সাথে আরো কিছু অ্যাড করেছি।'

'আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কী অ্যাড করেছেন?'

সাদেক সাহেব ভারী গলায় বললেন, অ্যাড করেছি—কনেপক্ষ ভাড়াটে গুণ্ডার সহায়তায় কোনোরকম পূর্ব উসকানি ছাড়া ধারাল অস্ত্রশস্ত্র যেমনঃ- লোহার রড, কিরিচসহ বরযাত্রীদের উপর আচমকা চড়াও হয়। বরযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী— যেমন মানিব্যাগ, রিস্টওয়াচ লুণ্ঠন করে। মহিলাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পূর্বপরিকল্পিত এই আক্রমণে বরসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়। তাহারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে। বরযাত্রীদের দু'টি গাড়িরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়। একটি গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এই আর কী! সব ডিটেল দেয়া হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, বলেন কী!

সাদেক সাহেব তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, সাজানো মামলা অরিজিন্যালের চেয়েও কঠিন হয়। অরিজিন্যাল মামলায় আসামি প্রায়ই খালাস পেয়ে যায়। সাজানো মামলায় কখনো পায় না। কুথা হল এভিডেন্স ঠিকমতো প্লেস করতে হবে।

'এভিডেন্স পাবেন কোথায়?'

বাংলাদেশে এভিডেন্স কোনো সমস্যা না। মার খেয়ে পা ভেঙেছে চান? পা ভাঙা লোক পাবেন। X-Ray রিপোর্ট পাবেন। রেডিওলজিস্টের সার্টিফিকেট পাবেন। টাকা খরচ করলে দুনম্বরি জিনিস সবই পাওয়া যায়।

মেজো ফুপু বললেন, টাকা আমি খরচ করব। জোঁকের মুখে আমি নুন ছেড়ে দেব। সাদেক মামলা শক্ত করার জন্যে তোমার যা যা করা লাগে করো। দরকার হলে আমি আমার গাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বলব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

তা লাগবে না। পুরানো গাড়ির দোকান থেকে ভাঙ্গা একটা গাড়ি এনে আগুন লাগিয়ে দিলেই হবে। তবে গাড়ির ব্লু বুক লাগবে। এটা অবশ্যি কোন ব্যাপার না।

ফুপু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি থাকায় ভরসা পাচ্ছি। ওদের আমি তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ব।

'সাদেক সাহেব বললেন, বাদলকে একটু দরকার। ওকে ব্যাক ডেট দিয়ে একটা ভাল ক্লিনিকে ভরতি করিয়ে দিতে হবে। মা'র খাবার পর মাথায় আঘাত পেয়ে আন্ডার অবজারভেশনে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে দরকার। কিছু এক্সরে-টেক্সরে করা দরকার।'

ফুপু উজ্জ্বল মুখে বললেন, তুমি অপেক্ষা করো। বাদল আসুক। আজই তাকে ক্লিনিকে ভরতি করিয়ে দিব। মাছ দেখেছে বরশি দেখেনি।

ফুপু প্রবল উৎসাহে মামলার সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে সাদেক সাহেবের সঙ্গে কথা

বলতে লাগলেন। আমি "নাকটা ঝেড়ে আসি ফুপু" বলে বের হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে উধাও হলাম। সাদেক সাহেব ভয়াবহ ব্যক্তি আমি উপস্থিত থাকলে পা-ভাঙা ফরিয়াদী হিসেবে আমাকেও হাসপাতালে ভরতি করিয়ে দিতে পারে। মামলা আরো পোক্ত করার জন্যে মুগুর দিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলাও বিচিত্র না।

পথে নেমেই মোফাজ্জল এবং জহিরুলের সঙ্গে দেখা। ওরা ঘোরাঘুরি করছে। আমাকে দেখে অকূলে কূল পাওয়ার মতো ছুটে এল— হিমু ভাইয়া না?

'হুঁ।'

'স্যারের বাসাটা ভুলে গেছি। স্যার আসতে বলেছিলেন।'

'এই বাড়ি। বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে চলে যান।'

'স্যারের শরীর কেমন হিমু ভাইয়া?'

'শরীর ভাল।'

'ফেরেশতার মতো আদমি। উনার মত মানুষ হয় না। স্যারের জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি।'

'খুব ভাল করেছেন। দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না। চলে যান।'

তারা গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রাত দশটার মতো বাজে। মীরাদের বাড়িতে একবার উঁকি দিয়ে যাব কি-না ভাবছি। মীরা ফিরেছে কি না দেখে যাওয়া দরকার।

মীরার বাবা ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে আছেন। আমাকে দেখে উঠে এলেন। আমি বললাম, মীরা এখনও ফেরেনি।

তিনি হাহাকার—মেশানো গলায় বললেন, জ্বি না।

'চিন্তা করবেন না চলে আসবে। এখন মাত্র দশটা চল্লিশ। বারোটা-সাড়ে বারোটার দিকে চলে আসবে।'

ভদ্রলোক অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছেন। তিনি এখন পুরোপুরি বিভ্রান্ত। আমি আবারও পথে নামলাম।

গা ঘেসে কোন গাড়ি যদি হার্ড ব্রেক করে তাহলে চমকে উঠাই নিয়ম। শুধু চমকে উঠা না, চমকে পেছনে ফিরতে হবে। এ রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি মাঝে মধ্যেই হই। রূপা এই কাণ্ডটা সবচে বেশী করে। গাড়ি নিয়ে হুট করে গা ঘেসে দাঁড়াবে, এবং বিকট শব্দে হর্ণ দেবে। ভেতরে ভেতরে চমকালেও বাইরে প্রকাশ করি না। কিছুই ঘটে নি ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকি যতক্ষণ না গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কেউ না ডাকে।

এবারও তাই করলাম। ঘ্যাস করে গা ঘেসে গাড়ি থেমেছে। হর্ণ দেয়া হচ্ছে। আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে সামনে এগুচ্ছি।

'হিমু সাহেব! এই যে হিমু সাহেব!'

আমি তাকালাম। স্টিয়ারিং হুইল ধরে অপরিচিত একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার মাথায় ইরানী মেয়েদের মত রঙ্গিন ঝলমলে স্কার্ফ। মেয়েটিকে দেখাচ্ছেও ইরানীদের মত।

'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জ্বি না।'

'সেকি। ভাল করে দেখুনতো।'

আমি ভাল করে দেখেও চিনতে পারলাম না। বাংলায় কথা বলে কোন ইরানী তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

'আমি ফারজানা।'

'ও বলছেন তার মানে এখনো চিনতে পারেন নি। আমি ডাক্তার। আপনার চিকিৎসা করেছিলাম। ঐ যে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন-।'

'এখন চিনতে পেরেছি। আপনি ড্রেস এজ য়্যু লাইক প্রতিযোগিতা করছেন নাকি? ইরানী মেয়ে সেজেছেন।'

'ডাক্তাররা সাজতে পারবেনা এমন কোন আইন আছে?'

'না আইন নেই।'

'আপনার যদি তেমন কোন কাজ না থাকে তাহলে উঠে আসুন।'

আমি গাড়িতে উঠলাম। ফারজানা বলল, আমি খুবই আনাড়ি ধরনের ড্রাইভার। আজই প্রথম সাহস করে একা একা বের হয়েছি।

আপনার কাজ হল- সামনের দিকে লক্ষ্য করা, যথাসময়ে আমাকে ওয়ার্নিং

দেয়া। পারবেন না।

'পারব। এক কাজ করলে কেমন হয়- ভীড়ের রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় চলে যাই।'

'ঢাকা শহরে ফাঁকা রাস্তা কোথায়?'

'হাইওয়েতে উঠবেন?'

'হাইওয়েতে কখনো উঠিনি।'

'চলুন আজ উঠা যাক। ময়মনসিংএর দিকে যাওয়া যাক। পথে ভদ্রটাইপের একটা জঙ্গল পড়বে। গাড়ি পার্ক করে আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারি।

'জঙ্গলে ঢুকব কেন?'

'ঢুকতে না চাইলে ঢুকবেন না। আমরা জঙ্গল পাশে ফেলে হোস করে চলে যাব।'

'আপনার পায়ে স্যাণ্ডেল নেই। স্যান্ডেল কি ছিড়ে গেছে।'

'গাড়ি চালাতে চালাতে পায়ের দিকে তাকাবেন না। এম্নিতেই আপনি আনাড়ি ড্রাইভার।'

'খুব আনাড়ি কি মনে হচ্ছে?'

'না- খুব আনাড়ি মনে হচ্ছে না।'

'আপনি কি জানেন হাসপাতাল থেকে আপনি চলে যাবার পর- বেশ কয়েকবার আপনার কথা আমার মনে হয়েছে। আপনার এক আত্মীয়ের টেলিফোন নাম্বার ছিল। বোধ হয় আপনার ফুপা। তাকে একদিন টেলিফোনও করলাম। তিনি বেশ খারাপ ব্যবহার করলেন।'

'ধমক দিলেন?'

'ধমক দেয়ার মতই। তিনি বললেন- আমাকে টেলিফোন করছেন কেন? হিমুর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আর কখনো টেলিফোন করে বিরক্ত করবেন না। বলেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।'

আমি হাসলাম।

ফারজানা বলল, হাসছেন কেন?

'আপনার গাড়ি চালানো খুব ভাল হচ্ছে- এই জন্যে হাসছি।'

'আমরা কি ময়মনসিংএর দিকে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

'যে জঙ্গলের কথা বলছেন সেখানে কি চা পাওয়া যাবে?'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে। পোষা জঙ্গল। সবই পাওয়া যায়। যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন- তখন পিকনিক করতে আসেন নি।'

'আমি পড়াশোনা দেশে করি নি। আমার এম ডি ডিগ্রী বাইরের।'

'বাংলাতো খুব সুন্দর বলছেন।'

'আমার মা ছিলেন বাঙালী।'

'ছিলেন বলছেন কেন?'

'ছিলেন বলছি কারণ- তিনি এখন নেই। তাঁর খুব সখ ছিল- তাঁর মেয়ে দেশে ফিরে দেশের মানুষের সেবা করবে। আমি বাংলাদেশে কাজ করতে এসেছি মা'র ইচ্ছা- পুরনের জন্যে। আমি ভেবে রেখেছি- এ দেশে পাঁচ বছর কাজ করব তারপর ফিরে যাব।'

'ক' বছর পার করেছেন?'

'তিন বছর কয়েক মাস। দাড়ান একজাক্ট ফিগার বলছি- তিনি বছর চার মাস।'

'বাংলাদেশে কাজ করতে কেমন লাগছে?'

'মাঝে মাঝে ভাল লাগে। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত লাগে। এ দেশের কিছু মজার ব্যাপার আছে। বিনয়কে এ দেশে দুর্বলতা মনে করা হয়, বদমেজাজকে ব্যক্তিত্ব ভাবা হয়। মেয়েমাত্রকেই অল্প বুদ্ধি ভাবা হয়। মেয়ে ডাক্তার বললেই সবাই ভাবে ধাত্রী। যারা বাচ্চা ডেলিভারী ছাড়া আর কিছু জানে না।'

'বাচ্চা ডেলিভারী ছাড়া আপনি আর কি জানেন?'

'আমি একজন নিউরোলজিস্ট । আমার কাজ কর্ম মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে। আপনার প্রতি আমার আগ্রহের এটাও একটা কারণ। যে কোন কারণেই হোক আপনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জ্বরের ঘোরে আপনি প্রলাপ বকতেন। সেই সব আমি শুনেছি। কিছু ম্যাগনেটিক ট্যাপে রেকর্ড করাও আছে।'

'রেকর্ড করেছেন?'

'জ্বি। রেকর্ডও করেছি। খুবই ইন্টারেস্টিং। আসলে আপনার উচিত একজন ভাল কোন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা। বাংলাদেশে ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন না?'

'আছেন একজন।

'একজন কেন? অনেকতো থাকার কথা।'

'একজনের নাম খুব শুনি। মিসির আলি সাহেব।'

'উনার সঙ্গে একটা এপয়েন্টমেন্ট করুন। প্রয়োজন মনে করলে আমিও যাব।'

'আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'আমার আগ্রহের কারণ আছে সেটা আপনাকে বলা যাবে না। ভাল কথা আপনার সেই বিখ্যাত জঙ্গল আর কতদূর?'

'এসে গেছি। মোড়টা পার হলেই জঙ্গল।'

'জঙ্গলে আরেকদিন গেলে কেমন হয়? আজ ইচ্ছা করছে না।'

'খুব ভাল হয়। শুধু একটা কাজ করুন আমাকে নামিয়ে দিয়ে যান- এসেছি যখন জঙ্গল দেখে যাই।'

'সত্যি নামতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

'ফিরবেন কি ভাবে?'

'ফেরা- কোন সমস্যা না। বাস পাওয়া যায়।'

ফারজানা দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

আমি শালবনে ঢুকে পড়লাম। পিকনিক পার্টি এড়িয়ে আমি ঢুকে পড়লাম গভীর জঙ্গলে। জঙ্গল সম্পর্কে আমার বাবার দীর্ঘ উপদেশ আছে-

"যখনই সময় পাইবে তখনই বনভূমিতে যাইবার চেষ্টা করিবে। বৃক্ষের সঙ্গে মানবশ্রেণীর বন্ধন অতি প্রাচীন। আমার ধারণা আদি মানব এক পর্যায়ে বৃক্ষের সহিত কথোপকথন করিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। তবে সাধনায় ফল হয়। মন কেন্দ্রীভূত করিতে যদি সক্ষম হও— তবে বৃক্ষের সহিত যোগাযোগেও সক্ষম হইবে। বৃক্ষরাজি তোমাকে এমন অনেক জ্ঞান দিয়ে সক্ষম হইবে যে জ্ঞান এম্নিতে তুমি কখনো পাইবে না।"

কড়া রোদ উঠেছে। শালবন ছায়া হয় না। তবু মোটামুটি ছায়াময় একটি বৃক্ষ দেখে তার নীচে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। শীতের রোদ আরামদায়ক। শুকনো পাতার চাদরে শুয়ে আছি। নড়াচড়া করলেই শুকনো পাতা মচমচ শব্দ করছে। যেন বলছে- নড়াচড়া করবে না। চুপচাপ শুয়ে থাক। শালগাছের যে ফুল হয় জানতাম না। পীতাভ ধরণের অনাকর্ষণীয় কিছু ফুল চোখে পড়ছে। শালের ফুলে কি গন্ধ হয়? এত উঁচুতে যে ছিড়ে গন্ধ শুঁকা সম্ভব না। প্রকৃতি নিশ্চয়ই এই ফুল মানুষের জন্যে বানায় নি। মানুষের জন্যে বানালে ফুল ফুটতো হাতের নাগালের ভেতর।

ঘুমের ভেতর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম— গাছ নিয়ে স্বপ্ন। গাছ আমার সঙ্গে কথা বলছে—। তবে উল্টা পাল্টা কথা বলছে— কিংবা মিথ্যা কথা বলছে। যেমন গাছটা বলল, হিমু তুমি কি জান এই পৃথিবীর সবচে প্রাচীন গাছটি বাংলাদেশে আছে। যার বয়স প্রায় ছ'হাজার বছর।

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলছ কেন? বাংলাদেশ উঠে এসেছে সমুদ্র গর্ভ থেকে। এমন প্রাচীন গাছ এ দেশে থাকা সম্ভব নয়।

'তোমাদের বিজ্ঞানীরা কি সব জেনে ফেলেছেন?'

'সব না জানলেও অনেক কিছুই জানেন।'

'গাছ যে একটি চিন্তাশীল জীবন তাকি বিজ্ঞানীরা জানেন?'

'অবশ্যই জানেন। জগদীশ চন্দ্র বসু বের করে গেছেন।'

'তাহলে বল গাছের মস্তিষ্ক কোনটি। একটা গাছ তার চিন্তার কাজটি কি ভাবে করে।'

'আমি জানি না তবে আমি নিশ্চিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা জানেন।'

'কাচকলা। কেউ কিচ্ছু জানে না।'

'বিরক্ত করবে না– ঘুমুতে দাও।'

'সৃষ্টি রহস্য বোঝার ব্যাপারে তোমরা গাছের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর না কেন? আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেইতো আমরা সাহায্য করতে পারি।'

'তোমরা সাহায্য করতে পার?'

'অবশ্যই পারি। আমাদের পাতাগুলি অসম্ভব শক্তিশালী এন্টেনা। এই এন্টেনার সাহায্যে আমরা এই বিপুল সৃষ্ট জগতের সব বৃক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি।'

'তাই নাকি?'

'মনে কর সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের একটা গ্রহে গাছ আছে। আমরা সেই গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। আমরা সেই গাছ থেকে তোমাদের জন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য এনে দিতে পারি।'

'বাহ ভাল তো।

'পৃথিবীর মানুষরা অমর হতে চায়। কিন্তু অমরত্বের কৌশল জানে না। এই এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জেই একটা গ্রহ আছে যার অতি উন্নত প্রাণীরা অমরত্বের কৌশল জেনে গেছে। তোমরা চাইলেই আমরা তোমাদের তা দিতে পারি।'

'শুনে অত্যন্ত প্রীত হলাম।'

'তুমি কি চাও?'

'না– আমি চাই না। আমি যথাসময়ে মরে যেতে চাই। হাজার হাজার বছর বেঁচে থেকে কি হবে।'

'তুমি চাইলে আমি তোমাকে বলতে পারি।'

'না আমি চাচ্ছি না। স্বপ্নে প্রাপ্ত কোন ঔষধের আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছ। এখন বিদেয় হও। ভাল কথা তোমার নাম কি?'

'আমার নাম টারমেনালিয়া বেলেরিকা।'

'এমন অদ্ভুত নাম?'

'এটা বৈজ্ঞানিক নাম– সহজ নাম বহেরা। আমরা কিন্তু অদ্ভুত গাছ। শালবনের ফাঁকে গজাই এবং লম্বায় শালগাছকেও ছাড়িয়ে যাই। আমাদের বাকলের রঙ কি বলতো? বলতে পারলে না। আমাদের বাকলের রঙ নীল। আচ্ছা যাও আর বিরক্ত করব না। এখন ঘুমাও।'

আমার ঘুম ভাঙ্গল সন্ধ্যার আগে আগে। জেগে উঠে দেখি সত্যি সত্যি একটা বহেরা গাছের নিচেই শুয়ে আছি। গাছ ভর্তি ডিমের মত ফুল। আমি খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে– আমি শুয়েছিলাম, শাল গাছের নিচে। শালের ফুল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঢাকায় যেতে হবে পায়ে হেঁটে। সেটা খুব খারাপ হবে না। শীতকাল হাঁটার আলাদা আনন্দ। তবে ঢাকায় কতক্ষণে পৌছাব কে জানে। মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। দেখাটা আজ রাতেও হতে পারে।

এক কাপ চা খাওয়া দরকার। বনের ভেতর কে আমাকে চা খাওয়াবে। আমি গলা উচিয়ে বললাম, আমার চারদিকে যে সব গাছ ভাইরা আছেন তাদের বলছি। আমার খুব চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে– আমি আপনাদের অতিথি। আপনারা কি আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন?

প্রশ্নটা করেই আমি চুপ করে গেলাম। উত্তরের জন্যে কান পেতে রইলাম। উত্তর পাওয়া গেল না তবে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হচ্ছিল গাছরা উত্তর দেবে।

দরজায় কোনো কলিংবেল নেই।

পুরানো স্টাইলে কড়া নাড়তে হল। প্রথমবার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় জবাব এল— কে? আমি চুপ করে রইলাম। প্রথমবারের— 'কে'-তে জবাব দিতে নেই। দ্বিতীয়বারে জবাব দিতে হয়। এই তথ্য আমার মামার বাড়িতে শেখা। ছোট মামা বলেছিলেন—

'বুঝলি হিমু, প্রথম ডাকে কখনো জবাব দিবি না। খবর্দার না! তুই হয়তো ঘুমুচ্ছিস, নিশুতি রাতে বাইরে থেকে কেউ ডাকল— হিমু! তুই বললি, জ্বি। তা হলেই সর্বনাশ! মানুষ ডাকলে সর্বনাশ না। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে সর্বনাশ। বাঁধা পড়ে যাবি। তোকে ডেকে বাইরে নিয়ে যাবে। এর নাম নিশির ডাক। কাজেই সহজ বুদ্ধি হচ্ছে—যে-ই ডাকুক প্রথমবারে সাড়া দিবি না। চুপ করে থাকবি। দ্বিতীয় বারে সাড়া দিবি। মনে থাকবে?'

আমার মনে আছে বলেই প্রথমবারে জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার কড়া নাড়লাম যাতে মিসির আলি সাহেব দ্বিতীয়বার বলেন—কে? আমি আমার পরিচয় দিতে পারি।

মিসির আলি দ্বিতীয়বার 'কে' বললেন না। দরজা খুলে বাইরে তাকালেন। খুব যে কৌতুহলী হয়ে তাকালেন তাও না। রাত একটার আগন্তুকের দিকে যতটুকু কৌতুহল নিয়ে তাকাতে হয় সে কৌতুহলও তাঁর চোখে নেই। পরনে লুঙ্গি। খালি গায়ে শাদা চাদর জড়ানো। ভদ্রলোকের মাথা ভরতি কাঁচাপাকা চুল। আমি ভেবেছিলাম টেকো মাথার কাউকে দেখব। আইনষ্টাইন মার্কা এত চুল ভাবিনি। আমি বললাম, স্যার স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আমার নাম হিমু।'

'আচ্ছা।'

'আপনার সঙ্গে কী কথা বলতে পারি?'

মিসির আলি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আগের মতো কৌতূহল শূন্য। তিনি কী বিরক্ত? বুঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক কি ঘুম থেকে উঠে এসেছেন? না বোধ হয়। ঘুমন্ত মানুষ প্রথম বার কড়া নাড়তেই কে বলে সাড়া দেবে না।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, কথা বলার জন্যে রাত দু'টা খুব উপযুক্ত

সময় নয়। আপনি জেগে ছিলেন তাই দরজার কড়া নেড়েছি। আপনি যদি বলেন তাহলে অন্য সময় আসব।

'আমি জেগেছিলাম না। ঘুমুচ্ছিলাম। যাই হোক আসুন, ভেতরে আসুন।'

'আমি ভেতরে ঢুকলাম। মিসির আলি সাহেব দরজার হুক লাগালেন। দরজার হুকটা বেশ শক্ত, লাগাতে তাঁর কষ্ট হল। অন্য কেউ হলে দরজার হুক লাগাত না। যে অতিথি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে তার জন্যে এত ঝামেলা করে দরজা বন্ধ করার দরকারটা কি।

'বসুন। ঐ চেয়ারটায় বসুন। হাতলের কাছে একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে। পাঞ্জাবিতে লাগলে পাঞ্জাবি ছিড়বে।'

মিসির আলি সাহেব পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি বসে বসে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। উল্লেখ করার মতো কিছুই চোখে পড়ছে না। কয়েকটা বেতের চেয়ার। গোল একটা বেতের টেবিল। টেবিলের উপরে বাংলা ম্যাগাজিন। উপরের পাতা ছিঁড়ে গেছে বলে ম্যাগাজিনের নাম পড়া যাচ্ছে না। এক কোনায় একটা চৌকি। চৌকিতে বিছানা পাতা। এই বিছানায় কে ঘুমায়? মিসির আলি সাহেব? মনে হয় না। এই ঘরে আলো কম। বিছানায় শুয়ে বই পড়া যাবে না। মিসির আলি সাহেবের নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস। তাঁর শোবার ঘরটা দেখতে পারলে হত।

মিসির আলি ঢুকলেন। তাঁর দুহাতে দুটা মগ। মগভরতি চা।

'নিন চা নিন। দু'চামচ চিনি দিয়েছি—আপনি কী চিনি আরও বেশি খান?'

'জ্বি না। যে যতটুকু চিনি দেয় আমি ততটুকুই খাই।'

'তিনি আমার সামনের চেয়ারটায় বসলেন। এরকম বিশেষত্বহীন চেহারার মানুষ আমি কম দেখেছি। কে জানে বিশেষত্বহীনতাই হয়তো তাঁর বিশেষত্ব। চা খাচ্ছেন শব্দ করে। নিজের চায়ের স্বাদে মনে হয় নিজেই মুগ্ধ। আমি এত আরাম করে অনেক দিন কাউকে চা খেতে দেখিনি।'

'তারপর হিমু সাহেব, বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন।'

'আপনাকে দেখতে এসেছি স্যার।'

'ও আচ্ছা। এর আগে বলেছিলেন— কথা বলতে এসেছেন। আসলে কোনটা?'

'দুটাই। চোখ বন্ধ করে তো আর কথা বলব না—আপনার দিকে তাকিয়েই কথা বলব।'

'তাও তো ঠিক। বলুন কথা বলুন। আমি শুনছি।'

'মানুষের যে নানান ধরনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা শোনা যায় আপনি কী তা বিশ্বাস করেন?'

'আমি যে রকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ এখনও কাউকে দেখিনি কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। আমার মন খোলা, তেমন ক্ষমতা

সম্পন্ন কাউকে দেখলে অবশ্যই বিশ্বাস করব।'

'আপনি কী দেখতে চান?'

'জ্বি না। আমার কৌতূহল কম। নানান ঝামেলা করে কোনো এক পীর সাহেবের কাছে যাব, তাঁর কেরামতি দেখব, সেই ইচ্ছা আমার নেই।'

'কেউ যদি আপনার সামনে এসে আপনাকে কোনো কেরামতি দেখাতে চায় আপনি দেখবেন?'

মিসির আলি চায়ের মগ নামিয়ে রাখলেন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন— সম্ভবত সিগারেট খুঁজছেন। এই ঘরে সিগারেট নেই। আমি ঘরটা খুব ভালমতো দেখেছি। মিসির আলি সাহেবের কাছে যেহেতু এসেছি স্বভাবটাও তাঁর মতো করার চেষ্টা করছি। পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা। আমি লক্ষ্য করলাম, মিসির আলি সাহেবের চেহারায় সূক্ষ্ম হতাশার ছাপ পড়ল—অর্থাৎ শোবার ঘরেও সিগারেট নেই। নিকোটিনের অভাবে তিনি খানিকটা কাতর বোধ করছেন।

'আমি বললাম, স্যার, আমার কাছে সিগারেট নেই।'

ভেবেছিলাম তিনি আমার কথায় চমকাবেন। কিন্তু চমকালেন না। তবে তাঁর ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির ছায়া দেখলাম। হাসিটা কী ব্যঙ্গের? কিংবা আমার ছেলেমানুষীতে তাঁর হাসি পাচ্ছে। না মনে হয়।

'স্যার, আমি নিজেও সামান্য ভবিষ্যৎ বলতে পারি। ঠিক আড়াইটার সময় কেউ একজন এসে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেবে।'

মিসির আলি এবারে সহজ ভঙ্গিতে হাসলেন। চায়ের মগে চুমুক দিতে দিতে বললেন, সেই কেউ একজনটা কী আপনি?'

'জ্বি স্যার। আড়াইটার সময় আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিয়ে যাব।'

'দোকান খোলা পাবেন?'

'ঢাকা শহরে কিছু দোকান আছে খোলেই রাত একটার পর।'

'ভাল।'

'আমি মিসির আলি সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আমি কিন্তু স্যার মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারি। সব সময় পারি না—হঠাৎ হঠাৎ পারি।'

'ভালতো!'

'আপনি কী আমার মতো কাউকে পেয়েছেন যে মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে।'

সব মানুষই তো মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। এটা আলাদা কোনো ব্যাপার না। ইনটিউটিভ একটা বিষয়। মাঝে মাঝে ইনটিউশন কাজে লাগে মাঝে মাঝে লাগে না। মস্তিষ্ক ভবিষ্যৎ বলে যুক্তি দিয়ে। সেইসব যুক্তির পুরোটা আমরা বুঝতে পারিনা বলে আমাদের কাছে মনে হয় আমরা আপনা আপনি

ভবিষ্যৎ বলছি।

'আমার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা ইনটিউটিভ গেজ ওয়ার্কের চেয়েও সামান্য বেশি। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না বলে আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা সম্পর্কে অন্যরা জানে?'

'যারা আমার কাছাকাছি থাকে, যারা আমাকে ভালমতো চেনে তারা জানে।'

'আপনার আশেপাশের মানুষদের এই ক্ষমতা দেখাতে আপনার ভাল লাগে, তাই না?'

'জ্বি, ভালই লাগে। একজন ম্যাজিশিয়ান সুন্দর একটা ম্যাজিক দেখাবার পর যেমন আনন্দ পায়—আমিও সে রকম আনন্দ পাই ।'

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি স্যার?'

'আমার ধারণা আপনি একধরনের ডিলিউশনে ভুগছেন। ডিলিউশন হচ্ছে নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। যে কোনো কারণেই হোক আপনার ভেতর একটা ধারণা জন্মেছে আপনি সাধুসন্ত টাইপের মানুষ। আপনার খালি পা, হলুদ পাঞ্জাবি এইসব দেখে তাই মনে হচ্ছে। যে কোনো ডিলিউশন মানুষের মাথায় একবার ঢুকে গেলে তা বাড়তে থাকে। আপনারও বাড়ছে। আপনি নিজে আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা নিয়ে একধরনের অহংকার বোধ করছেন। আপনাকে যতই লোকজন বিশ্বাস করছে আপনার ততই ভাল লাগছে। এখন রাত দু'টায় আপনি আমার কাছে এসেছেন— বিশ্বাসীর তালিকাবৃদ্ধির জন্যে। রাত দু'টার সময় না এসে আপনি সকাল দশটায় আসতে পারতেন। আসেন নি কারণ যে সাধু সেজে আছে সে যদি সকাল দশটায় আসে তা হলে তার রহস্য থাকে না। রহস্য বজায় রাখার জন্যেই আসতে হবে রাত দু'টার দিকে। হিমু সাহেব!'

'জ্বি স্যার?'

'আপনার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আপনি আমাকে নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদা প্রমাণ করার জন্যে আপনি অদ্ভুত আচার-আচরণ করেন। যেমন আপনার পায়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রচুর হাঁটেন। মনে হচ্ছে রাতেই হাঁটেন। কারণ দিনে হাঁটা তো স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে পরে। যেহেতু আপনি রাতে হাঁটেন—বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনার ডিলিউশনকে পোক্ত করতে এরাও সাহায্য করে। এদের কেউ কেউ আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মানেই আপনাকে—সাহায্য করা। আমার ধারণা এদের কেউ কেউ আপনাকে সাধুও ভাবে। আপনার পদধুলি নেয়।'

'মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই একজনকে সাধু হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করবে?'

'হ্যাঁ, তা করবে। মানুষ খুব যুক্তিবাদী প্রাণী হলেও তার মধ্যে অনেকখানি অংশ আছে যুক্তিহীন। মানুষ যুক্তি ছাড়াই বিশ্বাস করতে ভালবাসে। প্রাণী হিসেবে মানুষ সব সময় অসহায় বোধ করে। সে সারাক্ষণ চেষ্টা করে অসহায়ত থেকে মুক্তি পেতে। পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী হস্তরেখা, অ্যাস্ট্রলজি, নিউমারোলজির প্রতি এইসব কারণেই মানুষের বিশ্বাস।'

'আপনার ধারণা মানুষ কোনো বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে নি?'

'অবশ্যই মানুষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। একদিন যে মানুষ সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল জয় করবে তার ক্ষমতা অসাধারণ। তবে তার মানে এই না সে ভবিষ্যৎ বলবে। দু'টা বেজে গেছে—আপনার কথা ছিল না আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেয়া?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিসির আলি বললেন, চলুন আপনার সঙ্গে যাই। কোন দোকানটা রাত দুটার সময় খোলা থাকে আমাকে দেখিয়ে দিন। মাঝে মাঝে সিগারেটের জন্যে খুব সমস্যায় পড়ি।

মিসির আলি তাঁর ঘরের দরজায় তালা লাগালেন না। তালা খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘর খোলা রেখে গভীর রাতে বের হচ্ছেন তার জন্যেও তাঁর মধ্যে কোনো অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম না। ঘর খোলা রেখে বাইরে যাবার অভ্যাস তাঁর নতুন না এটা বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার মধ্যেও খানিকটা হিমু ভাব আছে।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি স্যার?'

'আপনি আমার কথায় আপসেট হবেন না। আমি আপনাকে হার্ট করার জন্যে কিছু বলিনি।'

'আপনি যে এ ধরণের কথা বলবেন তা আমি জানতাম।'

'সব জেনেশুনেই আমার কাছে এসেছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'আমার ধারণা আপনি আমার কাছে এসেছেন অন্য কোন সমস্যা নিয়ে- যা আপনি বলছেন না।'

'স্যার আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

'কি জিনিস?'

'আমি কিছুদিন আগে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। যা দেখে ভয় পেয়েছিলাম, সেই জিনিসটা আপনাকে দেখাতে চাই।'

'কেন? আপনি চান যে আমিও ভয় পাই?'

'তা না।'

'আমার কাছে শুনে আপনি ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন না।'

'তবু শুনি।'

আমি ভয় পাবার গল্পটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বললাম। মিসির আলি

গল্পের মাঝখানে একবারও কিছু জানতে চাইলেন না। হ্যাঁ হুঁ পর্যন্ত বললেন না। সিগারেট কিনলাম। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, আপনি একটা কাজ করুন। গল্পটা আবার বলুন।

'আবার বলব?'

'হ্যাঁ আবার।'

'কেন?'

'দ্বিতীয় বার শুনে দেখি কেমন লাগে। আমি আবারো গল্প শুরু করলাম। মিসির আলি সিগারেট টানতে টানতে তাঁর বাসার দিকে যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি এবং গল্প বলছি। তিনি নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন। আমি তাঁর মুখে চাপা হাসিও লক্ষ্য করছি।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনার গল্পটা ইন্টারেস্টিং, আমি আপনার সঙ্গে পরে এই নিয়ে কথা বলব।'

'আপনি যদি চান-যে জায়গাটায় আমি ভয় পেয়েছিলাম- সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

'আমি চাচ্ছি না।'

'তাহলে স্যার আমি যাই।'

'আচ্ছা। আবার দেখা হবে-ভাল কথা যে গলিতে আপনি ভয় পেয়েছিলেন- আপাতত সেই গলিতে না ঢুকা ভাল হবে।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'হঠাৎ ব্রেইনে চাপ সৃষ্টি না করাই ভাল। মানুষের একটা অসুখের নাম 'এরিকনোফোরিয়া' মাকড়সা ভীতি। এই অসুখ থেকে মানুষকে মুক্ত করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে তার গায়ে মাকড়সা ছেড়ে দেয়া। মাকড়সা তার গায়ে কিলবিল করে হাঁটবে। এবং রোগি বুঝতে পারবে যে মাকড়সা অতি নিরীহ প্রাণী। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে রোগ ভাল হয়— তবে কিছু ক্ষেত্রে খুব খারাপ ফল হয়-রোগি তখন চারদিকে মাকড়সা দেখতে পায়। আমি চাইনা— আপনার ক্ষেত্রে এই ঘটনা না ঘটুক।'

'স্যার যাই?"

'আচ্ছা।'

আমি চলে আসছি। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে ফিরে তাকালাম। মিসির আলি ঘরে ঢুকেন নি। এখনো বাইরে দাড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে? কি দেখছেন তারা। আমি একটু বিস্মিত হলাম— মিসির আলি ধরনের মানুষরা মাইক্রোসকোপ টাইপ। কাছের জিনিসকে তারা সাবধানে দেখতে ভালবাসেন। ধরা ছোঁয়ার বাইরের জগতের প্রতি তাদের আগ্রহ থাকার

কথা না। তারা অসীমের অনুসন্ধান করেন সীমার ভেতর থেকে।

মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে রাতটা হেঁটে হেঁটেই কাটিয়ে দি। যদিও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আসছে। পা ভারি হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। বস্তা ভাইয়ের পাশে গিয়ে কি শুয়ে থাকব? স্লিপিং ব্যাগে তাদের জীবন কেমন কাটছে সেটাও দেখতে ইচ্ছা করছে। ছেলেটার নাম যেন কি? গাবুল? না গাবুল না। অন্য কিছু। নামটা কি সে আমাকে বলেছে? আচ্ছা প্রতিটি গাছের কি মানুষের মত নাম আছে? গাছ মা'কি তার গাছ শিশুদের নাম রাখেন। আমরা যেমন গাছের নামে নাম রাখি— শিমুল, পলাশ, বাবলা, ওরাও কি পছন্দের মানুষের নামে তাদের পুত্র কন্যাদের নাম রাখে। যেমন একজনের নাম রাখল হিমু, আরেকজনের সোলায়মান।

ও হ্যাঁ মনে পড়েছে-বস্তা ভাইয়ের পুত্রের নাম- সুলায়মান। সুলায়মানকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

স্লিপিং ব্যাগের ভেতর পিতাপুত্র দু'জনই ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ঘুম ভাঙ্গালাম না। তাদের পাশে শুয়ে পড়লাম। এরা মনে হচ্ছে আমার জন্যে জায়গা রেখেছে। পাশের জায়গাটায় খবরের কাগজ বিছিয়ে রেখেছে। শুধু যে খবরের কাগজ তা না। খবরের কাগজের উপর বড় পলিথিনের চাদর। আমি শোয়ামাত্র স্লিপিং ব্যাগের মুখ খুলে গেল। সোলায়মান—তার মাথা বের করল।

'কি খবর সুলায়মান?'

সুলায়মান হাসল। তার সামনের দু'টা দাঁত পড়ে গেছে।

দাঁত পড়া সুলায়মানকে সুন্দর দেখাচ্ছে। সুলায়মান লাজুক গলায় বলল, আফনের জন্যে বাপজান জায়গা রাখছে।

'ভাল করেছে।'

'এখন থাইক্যা- আফনের এই জাগা 'রিজাভ'।'

'বাঁচা গেল। সব মানুষেরই কিছু না কিছু রিজার্ভ জায়গা দরকার। তুই কি পড়তে পারিস?'

'জে না।'

পড়াশোনাতো করা দরকাররে ব্যাটা।'

'গরীব মানুষের পড়ালেখা লাগে না।'

'কে বলেছে?'

'কেউ বলে নাই— আমি জানি।'

'এখন থেকেই নিজে নিজে জানা শুরু করেছিস?'

সুলায়মান দাঁত বের করে হাসল। চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, আফনেরে কি ডাকুম।

'যা ডাকতে ইচ্ছা হয় ডাক। কি ডাকতে ইচ্ছা করে?'

'মামা।'

'বেশতো মামা ডাকবি।'
'মামা— আফনে কিচ্ছা জানেন?'
'জানি—শুনবি?"

সুলায়মান হ্যাঁ না, কিছু বলল না। খুব সাবধানে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের হয়ে এল। সম্ভবত সে তার বাবার ঘুম ভাঙ্গাতে চাচ্ছে না। সুলায়মান এসে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। আমি গল্প শুরু করলাম— আলাউদ্দিনের চেরাগের গল্প। যে চেরাগের ভেতর অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন দৈত্য ঘুমিয়ে থাকে। তার যদি ঘুম ভাঙ্গানো যায় তাহলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। সব মানুষকেই একটি করে আলাউদ্দিনের চেরাগ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অল্প কিছু মানুষই চেরাগে ঘুমিয়ে থাকা দৈত্যকে জাগাতে পারে।

'সুলায়মান!'
'জ্বি মামা।'

'তোর মনের যে কোন একটা ইচ্ছার কথা বলতো দেখি। তোর যে কোন একটা ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

'আমার কোন ইচ্ছা নাই মামা।'
'আচ্ছা তাহলে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর চলে যা। বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে থাক।'
'আমি আপনের লগে ঘুমামু।'

সোলায়মান একটা হাত আমার গায়ে তুলে দিয়েছে। আমি চলে গেছি একটা অদ্ভুত অবস্থায়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে-অথচ ঘুম আসছে না। চোখ মেনে রাখতেও পারছি না, আবার চোখ বন্ধও করতে পারছি না। বিশ্রী অবস্থা।

'হ্যালো আঁখি কি বাসায় আছে।'
'আপনি কে বলছেন?'
'আমার নাম হিমু?'
'হিমুটা কে?"
'জ্বি আমি নীতুর বড় ভাই। নীতু হল আঁখির বান্ধবী।'
'তুমি আঁখির সঙ্গে কথা বলতে চাও কেন?'

'নীতুকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আঁখিদের বাসায় যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বের হয়েছে আর ফিরে আসেনি। আমরা আঁখিদের বাসা কোথায়, টেলিফোন নাম্বার কি কিছুই জানতাম না। অনেক কষ্টে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছি। মা খুব কান্নাকাটি করছেন। ঘন ঘন ফিট হচ্ছেন....?

'কি সর্বনাশ। ফিট হওয়ারইতো কথা। শোন হিমু-নীতু নামে কেউ এ বাড়িতে আসেনি। নীতু কেন কোন মেয়েই আসে নি।'

'আপনি একটু আঁখিকে দিন। আঁখির সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত মা শান্ত হবেন না। মা কথা বলবেন।'

'তুমি ধর আমি আঁখিকে ডেকে দিচ্ছি। আজকালকার মেয়েদের কি যে

হয়েছে-মাই গড। চিন্তাও করা যায় না।'

আমি ফোঁপানির মত আওয়াজ করে নিজের প্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আঁখিকে টেলিফোনে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না-এই অভিনয়টা সেই কারণেই দরকার হয়ে পড়েছিল।

আঁখি টেলিফোন ধরল। ভীত গলায় বলল, কে?
'আমি হিমু। নীতুর বড় ভাই।'
'আমিতো নীতু বলে কাউকে চিনি না।'

'আমি নিজেও চিনি না। নীতুর গল্পটা তৈরী করা ছাড়া উপায় ছিল না। কেউ তোমাকে টেলিফোন দিচ্ছিল না।'

'আপনি কে?'
'আমি হিমু।'
'হিমু নামেওতো আমি কাউকে চিনি না।'

'আমি বাদলের দূর সম্পর্কের ভাই। ঐ যে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল তুমি পালিয়ে চলে গেলে বলে বিয়ে হয় নি।'

'আপনি কি চান।'

'আমি কিছুই চাই না- বাদলের কারণে তোমাকে টেলিফোন করেছি। ও বোকা টাইপেরতো বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় নানান ধরণের পাগলামি করছে— আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি। তুমি ওকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভাল কাজ করেছ। বোকা স্বামীর সঙ্গে সংসার করা ভয়াবহ ব্যাপার।'

'উনি বোকা?'

'বোকাতো বটেই। ও হল বোকান্দর। বোকা যোগ বান্দর— বোকান্দর। সন্ধি করলে এই দাঁড়ায়। বোকা মানুষদের প্রতি বুদ্ধিমানদের কিছু দায়িত্ব আছে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে তুমি যদি এই দায়িত্ব পালন কর।'

'আমি বুদ্ধিমতী আপনাকে কে বলল?"

'শেষ মুহূর্তে তুমি বাদলকে বিয়ে করতে রাজি হওনি-এটি হচ্ছে তোমার বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। আঁখি শোন- তুমি বাদলের পাগলামি কমাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

'সরি আমি কিছু করতে পারব না।'

'ও কি সব পাগলামি করছে শুনলে তোমার মায়া হবে। একটা শুধু বলি- রাত বারটার পর ও তোমাদের বাসার সামনে হাঁটা হাঁটি করে। অন্য সময় করে না, কারণ অন্যসময় হাঁটা হাঁটি করলে তুমি দেখে ফেলবে। সেটা নাকি তার জন্যে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'শুনুন ভাল একটা মেয়ে দেখে আপনারা উনার বিয়ে দিয়ে দিন— দেখবেন পাগলামি সেরে যাবে।'

'সেটাই করা হচ্ছে। মেয়ে পছন্দ করা হয়েছে। মেয়ে খুব সুন্দর। শুধু একটু

শর্ট-পাঁচ ফুট। হাই হিল পরলে অবশ্যি বোঝা যায় না। মেয়ে গান জানে-রেডিওতে বি গ্রেডের শিল্পী।'

'ভালইতো।'

'ভালতো বটেই। ছাত্রীও খুব ভাল-এস.এস.সিতে চারটা লেটার এবং ষ্টার পেয়েছে। চারটা লেটারের একটা আবার ইংরেজীতে। ইংরেজীতে লেটার পাওয়া সহজ না।'

'আজকাল অনেকেই পাচ্ছে।'

'যারা পাচ্ছে—তারাতো আর এম্নি এম্নি পাচ্ছে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে চেম্বারস ডিকশনারী পুরোটা মুখস্ত।'

'আচ্ছা শুনুন— আপনার কথা শেষ হয়েছেতো আমি এখন রেখে দেব।'
'আপনি কোন সাহায্য করতে পারবেন না, তাই না?'
'জ্বি না— মেয়েটার নাম কি?"
'কোন মেয়েটার নাম?'
'যার সঙ্গে আপনার ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে।'

'তুমি সাহায্য না করলেতো বাদলের বিয়ে হবে না। আগে বাদলের ঘাড় থেকে আঁখি ভূতকে নামাতে হবে। ঘাড় খালি হলেই 'বাঁধন' ভূত চেপে বসবে।'

'মেয়েটার নাম বাঁধন?'
'হ্যাঁ।'
'খুব কমন নাম—।'

'কমনের ভেতরই লুকিয়ে থাকে আনকমন। আঁখি নামটাওতো কমন। কিন্তু তুমিতো আর কমন মেয়ে না।'

'আমিও কমন টাইপের মেয়ে।'

'অসম্ভব কমন টাইপের কোন মেয়ে-বিয়ের দিন বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে প্রেমিকের কাছে চলে যায় না। কমন টাইপের মেয়ে প্রেমিকের কথা ভুলে গিয়ে খুশি মনে বিয়ে করে ফেলে।'

'শুনুন আপনি খুব অশালীন কথা বলছেন। আমি কোন প্রেমিকের কাছে যাইনি। আমার কোন প্রেমিক নেই।'

'ও আচ্ছা।'
'মা'র সঙ্গে রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা শুনতে চান?'
'না।'

'না বললে হবে না, আপনাকে শুনতে হবে। আমাদের বাড়িতে খুব অদ্ভুত ব্যবস্থা। কখনোই কেউ আমার ইচ্ছায় কিছু করে না। কখনোই না। মনে করুন-ঈদের জন্যে শাড়ি কেনা হবে। আমার একটা হলুদ শাড়ি পছন্দ। আমি সেটা কিনতে পারব না। মা বলবে- হলুদ শাড়ি তোমাকে মানায় না। ছোটবেলায় খুব শখ ছিল নাচ শিখব। আমাকে শিখতে দেয়া হয় নি। নাচ শিখে কি হবে? আমার শখ ছিল সায়েন্স পরব- জোর করে আমাকে হিউম্যানিটিজ

গ্রুপে দেয়া হল। ধরুন আমার যদি কোন টেলিফোন আসে- আমাকে সে টেলিফোন ধরতে দেয়া হবে না। দফায় দফায় নানান প্রশ্নের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। "কে টেলিফোন করল?" "বান্ধবী?" "বান্ধবীর বাসা কোথায়?" "বাবা কি করেন?" ধরুন আমি কোন বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছি-হুট করে একসময় মা করবে কি হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে দিয়ে শুনবে আসলেই কোন মেয়ে কথা বলছে না কোন ছেলে কথা বলছে। আমার গায়ে হলুদের দিন কি হল শুনুন। আমি মাছ খেতে পারি না। গন্ধ লাগে। মাছের গন্ধে আমার বমি এসে যায়। না তারপরেও খেতে হবে। গায়ে হলুদের মাছ না খেলে অমঙ্গল হয়। মাছ খেলাম, তারপর বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিলাম। তখন খুব রাগ উঠে গেল—আমি রিকশা নিয়ে পালিয়ে চলে গেলাম বান্ধবীর বাড়িতে। এই হচ্ছে ঘটনা।'

'তোমার তাহলে কোন প্রেমিক নেই।'

'অপরিচিত কোন ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত নেই— আর আমার থাকবে প্রেমিক। অথচ দেখুন আমার সব বান্ধবীরা প্রেম বিশারদ। প্রেমিকের সঙ্গে সিনেমা দেখছে, রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছে। জয়দেবপুরে শালবনে হাঁটতে যাচ্ছে। আমার এক বান্ধবী নাম হল শম্পা। সে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলেছে। দেখুন না, কি রকম রোমান্টিক। আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন কি ছিল জানেন? একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়ে, তারপর গোপনে তাকে বিয়ে করব।'

'সেটাতো এখনো করতে পার। তবে তোমার মা বাবা খুব কষ্ট পাবেন।'
'আমি চাই তারা কষ্ট পাক।'

'তাহলে একটা কাজ করলে হয়— তুমি বাদলকেই কোর্টে বিয়ে করে ফেল। কেউ কিছু জানবে না। তোমার বাবা-মা শুরুতে প্রচন্ড রাগ করবেন। তারপর যখন জানবেন তুমি তাদের পছন্দের পাত্রকেই বিয়ে করেছ তখন রাগ পানি হয়ে যাবে। আইডিয়া তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

আঁখি চুপ করে আছে। আঁখি পরিকল্পনা ধুম করে ফেলে দেয় নি। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, তোমায় যা করতে হবে তা হচ্ছে- বাবা মা কে কঠিন একটা চিঠি লেখা — মা, আমি সারাজীবন তোমাদের কথা শুনেছি। আর না। এখন আমি আমার নিজের জীবন নিজেই বেছে নিলাম। বিদায়। বিদায়টা লিখবে প্রথমে ইংরেজী ক্যাপিটেল লেটার B বাংলা দায়। B দায়।

'আপনি আমাকে থ্রি ফোর এর বাচ্চা ভাবছেন?'

'ঠাট্টা করছি। তবে তোমাকে যা অবশ্যই করতে হবে তা হচ্ছে- বাসর করতে হবে - অপরিচিত কোন জায়গায়।'

'কোথায় সেটা?'
'আমার মেসেও হতে পারে। আমার অবশ্যি খুবই দরিদ্র অবস্থা।'
যাক এই সব ছেলেমানুষী আমার ভাল লাগছে না।'
'তাহলে থাক।'

'তাছাড়া আপনার ভাই-বাদল, মিঃ রেইন । ও কি রাজি হবে। আমার কাছে আইডিয়াটা খুবই মজার লাগছে কিন্তু তার কাছে লাগবে।'

'ও বিরাট গাধা। তুমি যা বলবে ও তাতেই রাজি হবে।'

'মানুষকে হুট করে গাধা বলবেন না।'

'সরি আর বলব না।'

'বিয়েতে সাক্ষী লাগবে না?'

'সাক্ষী নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না। তুমি চলে এস।'

'কোথায় চলে আসব?'

'মগবাজার কাজি অফিসে চলে আস। বাদল সেখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আপনি পাগলের মত কথা বলছেন কেন? মি. রেইন শুধু শুধু মগবাজার কাজি অফিসে বসে থাকবে কেন?'

'বাদল সেখানে আছে কারণ আমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে তারপর তোমাকে টেলিফোন করেছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বললেই তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে।'

'হিমু সাহেব শুনুন। নিজের উপর এত বিশ্বাস রাখবেন না। আমি আপনার প্রতিটি কথায় তাল দিয়ে গেছি দেখার জন্যে যে আপনি কতদূর যেতে পারেন।

'তুমি তাহলে কাজি অফিসে আসছ না?'

'অবশ্যই না। এবং আমি আপনার প্রতিটি মিথ্যা কথাও ধরে ফেলেছি।

'কোন কোন মিথ্যা ধরলে।'

'এই যে আপনি বললেন, মিঃ রেইন মগবাজার কাজি অফিসে বসে আছে।'

'কি ভাবে ধরলে।'

'এখনো ধরিনি। তবে ধরব। মগবাজার কাজি অফিস আমাদের বাসা থেকে দু'মিনিটের পথ। আমি এক্ষুণি সেখানে যাচ্ছি।'

'শুধু দেখার জন্যে বাদল সেখানে আছে কিনা?'

'হ্যাঁ।'

খট করে শব্দ হল। আঁখি টেলিফোন রেখে দিল। আমি মনে মনে হাসলাম। বাদলকে আমি আসলেই কাজি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে একা না সঙ্গে দুজন সাক্ষীও আছে। মোফাজ্জল এবং জহিরুল।

ওদের জন্যে সুন্দর একটা বাসর ঘরের ব্যবস্থা করতে হয়। সবচে ভাল হত রাতটা যদি তারা দুজনে গাছের নিচে কাটাতে পারত। সেটা সম্ভব না। গল্পে উপন্যাসে গৃহ বিতারিত তরুণ তরুণীর গাছ তলায় জীবন কাটানোর কথা পাওয়া যায়। বাস্তব গল্প উপন্যাসের মত নয়।

রাত দশটায় ফুপুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঘটনা কতদূর গড়িয়েছে জানা দরকার।

বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট গ্যাঞ্জাম । ফুপুর মাথায় আইস ব্যাগ চেপে ধরা

আছে। পাশেই ফুপা। তিনিও রণ হুংকার দিচ্ছেন। ফুপু বললেন, খবর কিছু শুনেছিস হিমু!

'কি খবর।'

'হারামজাদাটা ঐ বদ মেয়েটাকে কোর্ট ম্যারেজ করেছে। ওর চামড়া ছিলে তুলে মরিচ লাগিয়ে দেয়া দরকার।'

কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলেছে- বাদলের মত নিরীহ ছেলে।'

নিরীহ ছেলেকে আর নিরীহ আছে? ডাইনীর খপ্পড়ে পড়েছে না।'

ফুপা বললেন, আমি তো কল্পনাও করতে পারছি না। কি ইচ্ছা করছে জানিস হিমু?

'না। কি ইচ্ছা করছে ।'

'ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড়া করিয়ে হারামজাদাটাকে গুলি করে মারতে।'

ফুপু কঠিন চোখে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইসব আবার কি ধরনের কথা। নিজের ছেলের মৃত্যু কামনা।

আহা কথার কথা বলেছি। গাধাটার তো দোষ নেই। ডাইনীর পাল্লায় পড়েছে না।'

আমি বললাম, নিজের ছেলের বউকেও ডাইনী বলা ঠিক হচ্ছে না। দুজনই ছেলে মানুষ একটা ভুল করেছে... এখন উচিত ক্ষমা সুন্দর চোখে....

ফুপু গর্জন করে উঠলেন, হিমু তুই দালালী করবি না। খবর্দারি বললাম। এই বাড়ি চিরদিনের জন্যে ওদের জন্যে নিষিদ্ধ।

'বেচারারা বাসর রাতে পথে পথে ঘুরবে।'

কেউ যদি জায়গা না দেয় পথে পথে ঘুরা ছাড়া গতি কি। আঁখি বাদলকে নিয়ে তার মা'র বাড়িতে গিয়েছিল। তিনি মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।'

'তাতো দিবেই। বদের ঝাড় না? আমার ছেলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে এতবড় সাহস। আমি এই বাড়িতেই আমার ছেলের বাসর করব।

'এটা মন্দ না। লাইট ফাইট নিয়ে আসি।'

'লাইট-ফাইট কেন?'

'আলোক সজ্জা করতে হবে না?'

'আলোক সজ্জাতো পরের ব্যাপার-বাসর ঘর সাজাতে হবে। ফুল আনতে হবে। এত রাতে ফুল পাবি?'

'পাব না মানে?'

ফুপু মাথার আইস ব্যাগ ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন।

ফুপার চোখ চক চক করছে। মনে হয় ছেলের বিবাহ উপলক্ষে আজ তিনি বোতল খুলবেন। তাঁর সঙ্গির অভাব হবে না। মোফাজল এবং জহিরুল বাড়ির সামনেই ঘোরাঘুরি করছে। সিগন্যাল পেলেই চলে আসবে।

সাদেক সাহেব শুকনো মুখে ফুপুদের বসার ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে এক কাপ চা। নাশতার প্লেটে দু'পিস কেক। দেখেই মনে হচ্ছে অনেক দিনের বাসি, ছাতাপড়া। আমাকে দেখে ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, বাড়ির সবাই কোথায় গেছে জানেন?

আমি বললাম, না। যদিও সুনসান নীরবতা দেখে কিছুটা আঁচ করতে পারছিলাম। বাদল এবং আঁখি হানিমুন করতে কক্সবাজারের দিকে রওনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে এ বাড়ির সবাইও রওনা হয়েছে। ফুপা সম্প্রতি একটা মাইক্রবাস কিনেছেন। মাইক্রবাস ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন সুযোগ হয়েছে। হানিমুনে স্বামী স্ত্রী একা থাকবে এটাই নিয়ম। এ বাড়িতে সব নিয়মই উল্টোদিকে চলে।

'বাড়ির সবাই কোথায় আপনি জানেন না?'

'জ্বি না।'

'ওরা সবাই কক্সবাজার চলে গেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'কাজের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

'আপনি মনে হয় কিছুটা আপসেট হয়েছেন।'

'আপসেট হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? আপনার ফুপুর ঠেলাঠেলিতে মামলার সমস্ত ব্যবস্থা করে চারজনকে আসামী দিয়ে মামলা দায়ের করে বাসায় এসে শুনি সবাই কক্সবাজার।'

'মামলা দায়ের হয়েছে?'

'অবশ্যই হয়েছে। পাঁচজন সাক্ষি জোগাড় করেছি। এর মধ্যে মারাত্মক আহত আছে দু'জন। দু'জনই হাসপাতালে চিকিৎসাধিন। আসামী করেছি তিনজনকে মেয়ের বাবা, মেয়ের বড় মামা আর মেজো মামা। আজই ওয়ারেন্ট ইস্যু হবে।'

'আপনিতো ভাই খুবই করিৎকর্মা মানুষ। ডায়নামিক পার্সোনিলিটি।'

প্রশংসায় সাদেক সাহেব খুশি হলেন না। তিনি আরো মিইয়ে গেলেন। বাসি কেক কচকচ করে খেয়ে ফেললেন।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'আমার অবস্থাটা চিন্তা করুন। যাদের নামে মামলা করেছি তারা ফরিয়াদীদের সঙ্গে মিলেমিশে মেয়ে এবং মেয়ের জামাই-এর সঙ্গে হানিমুনে চলে গেছে।'

'ঐ পার্টিও গেছে নাকি?'

'জ্বি তারাও গিয়েছে। আমি এখান থেকে টেলিফোন করে জেনেছি। তারা আরেকটা মাইক্রবাস ভাড়া করেছে।'

'বাহ্ ভালতো।'

সাদেক সাহেব রেগে গেলেন। হতভম্ব গলায় বললেন, ভালতো মানে? ভালতো বলছেন কেন?

'কিছু ভেবে বলছি না, কথার কথা বলছি।'

'আমার অবস্থাটা আপনি চিন্তা করছেন?'

'আসলে মামলার কথাতে নেচে উঠাটা আপনার ঠিক হয়নি। সবুর করা উচিত ছিল। সবুরে 'ফ্রুট' ফলে বলে একটা কথা আছে। সবুর করলে আপনাকে এই ঝামেলায় যেতে হত না। ফ্রুট ফলতো আপনিও মাইক্রবাসে করে হানিমুন পার্টিতে সামিল হতে পারতেন।'

'রসিকতা করছেন?'

'রসিকতা করছি না।'

'দয়া করে রসিকতা করবেন না। রসিকতা আমার পছন্দ না। আমি সিরিয়াস ধরণের মানুষ।'

'চা খাবেন?"

'না চা খাব না। আচ্ছা দিতে বলুন। আমার মাথা আউলা হয়ে গেছে এখন করবটা কি বলুনতো?'

'সাজেশান চাচ্ছেন?"

'না সাজেশান চাচ্ছি না। আমি অন্যের সাজেশানে চলি না।'

'না চলাই ভাল ফুপুর সাজেশান শুনে আপনার অবস্থাটা কি হয়েছে দেখুন। পুরোপুরি ফেঁসে গেছেন।'

সাদেক সাহেব সিগারেট ধরালেন। বেচারাকে দেখে সত্যি সত্যি মায়া লাগছে।

'সাদেক সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি মন খারাপ করবেন না। আমি আছি আপনার সঙ্গে।'

'আপনি আমার সঙ্গে আছেন মানে কি?'

'ওরা যা ইচ্ছা করুক। ওদের মিল মহব্বতের আমরা তোয়াক্কা করি না।

আমরা আমাদের মত মামলা চালিয়ে যাব।'

'আবার রসিকতা করছেন?'

'ভাই আমি মোটেই রসিকতা করছি না। আমি সিরিয়াস। আঁখির বাবা এবং দুই মামাকে আমরা হাজতে ঢুকিয়ে ছাড়ব। পুলিশকে দিয়ে রোলারের ডলা দেওয়াব। কানে ধরে উঠ বোস করাব।'

'হিমু সাহেব। আপনার কি মাথা খারাপ? আপনি উন্মাদ?'

'আমি উন্মাদের মত কথা বলছি?'

'অবশ্যই বলছেন।'

'তাহলে আরেকটা সাজেশান দি। আপনি নিজেও কক্সবাজার চলে যান। আসামী ফরিয়াদী দুই পার্টিকেই একসঙ্গে ট্যাকল করুন। দু'পার্টিই আপনার চোখের সামনে থাকবে। আপনি বিচক্ষণ আইনবিদ। আইনের প্যাঁচে ফেলে হালুয়া টাইট করে দিন। ওরা বুঝুক হাউ মেনি প্যাডি, হাউ মেনি রাইস।'

'শুনুন হিমু সাহেব–আপনি আপনার মাথার চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করুন। ইউ আর এ সিক পারসন।'

'আপনার চায়ের কথা বলা হয় নি। দাঁড়ান চায়ের কথা বলে এসে আপনার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেব।'

সাদেক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে দ্বিতীয় বাক্য বলার সুযোগ না দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে–ঝড়ের বেগে নিক্রমন।

ফুপুর কাজের ছেলে রশীদ আমার খুব যত্ন নিল। আমাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। রশীদের বয়স আঠারো উনিশ। শরীরের বাড় হয়নি বলে এখনো বালক বালক দেখায়। ফুপার বাড়িতে সে গত দু'বছর হল আছে। ফুপুর ধারণা রশীদের মত এক্সপার্ট কাজের ছেলে বাংলাদেশে দ্বিতীয়টা নেই। সে একা একশ' না একাই তিনশ। কথাটা মনে হয় সত্যি।

রশীদ দাঁত বের করে বলল, আইজ আর কই ঘুরবেন। শুইয়া বিশ্রাম করেন। মাথা মালিশ কইরা দিমু। দুপুরে আফনের জন্যে বিরানী পাকামু।

'বিরানী রানতে পারিস?"

'আমি পারি না এমন কাম, এই দুনিয়াতে পয়দা হয় নাই। সব কিসিমের কাম এই জীবনে করছি।'

'বলিস কি?'

'আমার ভাইজান আফনের মত অবস্থা। বেশীদিন কোন কামে মন টিকে না। চুরি ধারি কইরা বিদায় হই।'

'চুরি ধারি করিস?'

'পরথম করি না। শেষ সময়ে করি। বিদায় যেদিন নিমু তার এক দিন আগে করি। ভাইজান আফনের চুল বড় হইছে চুল কাটবেন?"

'নাপিতের কাজও জানিস?'

'জানি। মর্ডান সেলুনে এক বছর কাম করছি। কলাবাগান। ভাল সেলুন। এসি ছিল। কারিগরও ছিল ভাল।'

'নাপিতের দোকান থেকে কি চুরি করেছিলি?'

'ক্ষুর, কেঁচি, চিরুনী, দুইটা শ্যাম্পু এইসব টুকটাক.....'

'খারাপ কি? ছোট থেকে বড়। টুকটাক থেকে একদিন ধুরুম ধারুম হবে। দে চুল কেটে দে।'

আমি হাত পা ছড়িয়ে বারান্দায় মোড়ায় বসলাম। রশীদ মহা উৎসাহে আমার চুল কাটতে বসল।

'মাথা কামাইবেন ভাইজান?'

'মাথা কামানোর দরকার আছে?'

'শখ হইলে বলেন। মাথা কামানিটা হইল শখের বিষয়।'

'মাথা কামাতে তোর যদি আরাম লাগে তাহলে কামিয়ে দে। সমস্যা কিছু নেই। আমার মাথায় চুল থাকাও যা না থাকাও তা।'

রশীদ গম্ভীর মুখে বলল, লোকের ধারণা মাথা কামানি খুব সহজ। আসলে কিন্তু ভাইজান বড়ই কঠিন কাজ।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, জগতের যাবতীয় কঠিন কাজই আপাত দৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হয়। সহজ কাজকে মনে হয় কঠিন। যেমন ধর সত্য কথা বলা। মনে হয় না খুব সহজ, ইচ্ছা করলেই পারা যাবে। আসলে ভয়ংকর কঠিন। যে মানুষ এক মাস কোন মিথ্যা না বলে শুধুই সত্যি কথা বলবে ধরে নিতে হবে সে একজন মহামানব।

'ভাইজান।'

'বল।'

'আপনার সঙ্গে আমার একটা পেরাইভেট কথা ছিল।'

'বলে ফেল।'

'আফনের কাছে আমি একটা জিনিশ চাই ভাইজান– আফনে না বলতে পারবেন না।'

'কি জিনিশ চাস?"

'সেইটা ভাইজান পরে বলতেছি। আগে আফনে ওয়াদা করেন দিবেন।'

'তুই চাইলেই আমি দিতে পারব এটা ভাবলি কি করে?'

'আফনে মুখ দিয়া একটা কথা বললেই সেইটা হয়– এইটা আমরা সবেই জানি।'

'তোকে বলেছে কে?'

'বলা লাগে না ভাইজান। বুঝা যায়। তারপরে বাদল ভাই বলছেন। বাদল ভাইয়ের বিবাহ গেছিল ভাইঙ্গা। বাদল ভাই আফনেরে বলল– সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক।'

'তুই চাস কি?'

'বিদেশ যাইতে খুব মন চায় ভাইজান। দেশে মন টিকে না।'

'আচ্ছা যা হবে।'

রশীদ মাথা কামানো বন্ধ করে তৎক্ষনাৎ আমার পা ছুঁয়ে ভক্তি ভরে প্রণাম করল। আমি সিদ্ধ পুরুষদের মতই তার শ্রদ্ধা গ্রহণ করলাম। মানুষকে ভক্তি করতে ভাল লাগে না। মানুষের ভক্তি পেতে ভাল লাগে।

আমার মাথা কামানো হল। মাথা ম্যাসেজ করা হল। গা মালিশ করা হল। দুপুরে হেভি খানাপিনা হল। খাসির বিরিয়ানী, মোরগীর রোষ্ট। অতি সুস্বাদু রান্না। ভরপেট খাবার পরেও মনে হচ্ছে আরো খাই।

'রশীদ তুইতো ভাল রান্না জানিস।'

'চিটাগাং হোটেলে বাবুর্চির হেল্পার ছিলাম ভাইজান। বাবুর্চির নাম–ওস্তাদ মনা মিয়া। এক লম্বর বাবুর্চি ছিল। রান্ধনের কাজ সব শিখছি ওস্তাদের কাছে।'

'ভাল শিখেছিস। খুব ভাল শিখেছিস।'

'রাইতে ভাইজান আফনেরে চিতল মাছের পেটি খাওয়ামু। এইটা একটা জিনিশ।'

'কি রকম জিনিশ?'

'একবার খাইলে মিত্যুর দিনও মনে পড়ব। আজরাইল যখন জান কবচের জন্যে আসব তখন মনে হইব–আহারে চিতল মাছের পেটি। ওস্তাদ মনা মিয়া আমারে হাতে ধইরা শিখাইছে। আমারে খুব পিয়ার করতো।'

'ওস্তাদের কাছ থেকে কি চুরি করলি।'

রশীদ চুপ করে রইল। আমি আর চাপাচাপি করলাম না। দুপুরে লম্বা ঘুম দিলাম। রাতে খেলাম বিখ্যাত চিতল মাছের পেটি। সেই রান্না শিল্পকর্ম হিসেবে কতটা উত্তীর্ন বলতে পারলাম না–কারণ শুরুতেই গলায় কাঁটা বিধে গেল। মাছের কাটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু একে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রতিনিয়তই সে জানান দিতে থাকে। আমি আছি। আমি আছি। আমি আছি। ঢোঁক গেলার প্রয়োজন নেই তারপরেও ক্রমাগত ঢোঁক গিলে যেতে হয়। কাঁটার প্রসঙ্গে আমার বাবার কথা মনে পড়ল। তাঁর বিখ্যাত বাণীমালায় কাঁটা সংক্রান্ত বাণীও ছিল।

কন্টক

কাঁটা কন্টক, শলা, তরুনখ, সূচী চোঁচ

বাবা হিমালয় শৈশবে কইমাছের ঝোল খাইতে গিয়া একবার তোমার গলায় কইমাছের কাঁটা বিঁধিল। তুমি বড়ই অস্থির হইলে। মাছের কাঁটার যন্ত্রণা তেমন অসহনীয় নয় তবে–বড়ই অস্বস্থিকর। কন্টক নীরবেই থাকে তবে সে প্রতিনিয়তই সে তার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। কন্টকের এই স্বভাব তোমাকে জানাইবার জন্যই আমি তোমার গলার কাঁটা তুলিবার কোন ব্যবস্থা করি নাই। তুমি কিছুদিন গলায় কাঁটা নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে। বাবা হিমালয়,

তুমি কি জান যে মানুষের মনেও পরম করুণাময় কিছু কাঁটা বিধাইয়া দেন? একটি কাঁটার নাম-মন্দ কাঁটা। তুমি যখনই কোন মন্দ কাজ করিবে তখনই এই কাঁটা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তুমি অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিবে। ব্যথা বোধ না অস্বস্তিবোধ।

সাধারণ মানুষদের জন্যে এইসব কাঁটার প্রয়োজন আছে। সিদ্ধ পুরুষদের জন্যে প্রয়োজন নাই। কাজেই কন্টকমুক্তির একটা চেষ্টা অবশ্যই তোমার মধ্যে থাকা উচিত। যেদিন নিজেকে সম্পূর্ণ কন্টকমুক্ত করিতে পারিবে সেইদিন তোমার মুক্তি। বাবা হিমালয়, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে একটা কথা বলি মহাপাষাণ্ডরাও কন্টকমুক্ত থাকে। এই অর্থে মহাপুরুষ এবং মহাপাষণ্ডের ভেতরে তেমন কোন প্রভেদ নাই।

গলায় কাঁটা নিয়ে রাতে আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভদ্রলোক মনে হচ্ছে কোন ঘোরের মধ্যে আছেন। আমার মুন্ডিত মস্তক তাঁর নজরে এল না। তিনি হাসিমুখে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

'ভাই সাহেব আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন।'

'আজ কি বিশেষ কোন দিন?'

'জ্বি। আজ আমার মেয়ের পানচিনি হয়ে গেছে।'

'বলেন কি?"

'কি যে আনন্দ আমার হচ্ছে ভাই। একটু পর পরেই চোখে পানি এসে যাচ্ছে।'

তিনি চোখ মুছতে লাগলেন। চোখ মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই মুছছেন। চোখ লাল হয়ে আছে। আমি বললাম, আপনার মেয়ে কোথায়? এত বড় উৎসব বাসা খালি কেন?

'মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছিল। আমার কান্না দেখেই কাঁদছিল। শেষে তার মামাতো ভাইবোনরা এসে নিয়ে গেছে। আমাকেও নিতে চাচ্ছিল আমি যাইনি।'

'যান নি কেন?"

'ইয়াসমিন একা থাকবে। তাছাড়া মেয়ের বিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে একটু কথাবার্তাও বলব। আমার দায়িত্ব এখন শেষ।'

'উনার দায়িত্বওতো শেষ। মেয়েকে আর চোখে চোখে রাখতে হবে না। উনি আবার মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবেন নাতো? জীবিত শাশুড়িকেই জামাইরা দেখতে পারেন না–উনি হলেন ভূত শাশুড়ি।

আশরাফুজ্জামান সাহেব করুণ গলায় বললেন, আমার স্ত্রী সম্পর্কে এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করবেন না ভাই। আমি খুব মনে কষ্ট পাই।

'আচ্ছা যান আর করব না।'

'ভাই আজ রাতটা আপনি আমার সঙ্গে থেকে যান। দু'জনে গল্প গুজব করি।'

'আমি থাকলে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন কি ভাবে?'

'ওর সঙ্গেতো সারাক্ষণ কথা বলি না। কথাবার্তা সামান্যই হয়। ওর কথা বলতে কষ্ট হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'হিমু সাহেব! ভাই আমার অনুরোধটা রাখুন। থাকুন আমার সঙ্গে। বিছানায় ধোয়া চাদর দিয়ে দিচ্ছি।'

'চাদর ফাদর কিছু লাগবে না। একটা বিড়াল লাগবে। আপনার বাসায় কি বিড়াল আছে?'

'জ্বি না বিড়াল লাগবে কেন?"

'আমার গলায় কাঁটা ফুটেছে। বিড়ালের পা ধরলে নাকি গলার কাঁটা যায়....'

'এইসব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। এইসব হচ্ছে কুসংস্কার। গরম লবণ পানি দিয়ে গার্গল করেন গলার কাঁটা চলে যাবে। আমি গরম পানি এনে দিচ্ছ। গলার কাঁটার খুব ভাল হোমিওপ্যাথি অষুধ আছে। কাল সকালে আমি আপনাকে জোগাড় করে দেব-অ্যাকোনাইট ৩স'

'আপনি তাহলে হোমিওপ্যাথিও জানেন?'

'ছোট বাচ্চা মানুষ করেছি হোমিওপ্যাথিতো জানতেই হবে। বই পড়ে পড়ে শিখেছি, স্বআরোহিত জ্ঞান। আপনার যদি দীর্ঘদিনের কোন ব্যধি থাকে-বলবেন চিকিৎসা করব। তখন বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে একজন ভাল চিকিৎসক।'

'ভয় পাওয়া রোগ সারাতে পারবেন?'

'ভয় পাওয়া রোগ? আপনি ভয় পান?'

'একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়টা মনে গেঁথে ক্রনিক হয়ে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে-পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'এই দু'টি রোগেরই হোমিওপ্যাথিতে খুব ভাল চিকিৎসা আছে। ভূত-প্রেত দেখতে পেলে-স্ট্রামোনিয়াম ৬, আর যদি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন তাহলে খেতে হবে প্ল্যাটিনা ৩০, দু'টাই মানসিক অসুখ।'

'মনে হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে মানসিক রোগের ভাল চিকিৎসা আছে।'

'অবশ্যই আছে। যেমন ধরুন কেউ যদি মনে করে সব বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান তাকে দিতে হবে কফিয়া ৬, অনবরত কথা বলা রোগের জন্যে-ল্যাকেসিস ৬, লোকের সঙ্গ বিরক্তি এলে নাক্সভমিকা ৩, উদাসিন ভাব, অ্যাসিড ফস-৩, খুন করার ইচ্ছা জাগলে- হায়োসায়েমাস ৩, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা-অরাম সেট ৩০, কথা বলার সময় কান্না পেলে-পালস্‌ ৬, অতিরিক্ত ধর্মচিন্তা- নাক্সভমিকা।'

'অতিরিক্ত কথা বলার ইচ্ছা কমে কোন অষুধে বললেন?'

'ল্যাকেসিস ৬'

'ঘরে আছে না?'

'জ্বি আছে। গলার কাঁটার অষুধটা নেই। এইটা আছে।'

'আপনারতো মনে হয় ল্যাকেসিস ৬ অষুধটা নিয়মিত খাওয়া উচিত।'

'হিমু সাহেব আমি কিন্তু কথা কম বলি। কথা বলার মানুষই পাই না। কথা বলব কি করে? আমার মেয়েতো আমার সঙ্গে কথা বলে না । যখন ছোট ছিল তখন বলত। এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই সে দূরে সরে যাচ্ছে। কথা কম বলা রোগেরও ভাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আছে-অ্যাসিড ফস ৬, উদাসিন ভাবের জন্যে অ্যাসিড ফস ৩, আর কথা কম বলা রোগের জন্যে অ্যাসিড ফস ৬, কিন্তু আমার অষুধ খাবে না। ওর ধারণা হোমিওপ্যাথি হল চিনির দলা। কোন একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। পরীক্ষা না করেই কেউ যদি বলে চিনির দলা। সেটা কি ঠিক?'

'জ্বি না ঠিক না।'

'আমাদের নিয়ম হচ্ছে পরীক্ষা ছাড়াই সিদ্ধান্ত। খারাপ না?'

'খুবই খারাপ।'

'আমি কথা বেশী বলায় বিরক্ত হবেন না। অনেকদিন পর আপনাকে পেয়েছি বলে এত কথা বলছি। আপনিতো আর সাধারণ মানুষের মত না যে-আপনার সঙ্গে মেপে মেপে কথা বলতে হবে।'

'আমি সাধারণ মানুষের মত না?'

'অবশ্যই না। ঐ দিন আপনি আমার কন্যার বাড়ি ফেরা সম্পর্কে যে সময় বলে গিয়ে ছিলেন, সে ঠিক সেই সময় ফিরেছে। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। এ্যাজ এ মেটার অব ফেক্ট আমার বিষ্ময় ভাব এখনো যায় নি। প্রচণ্ড আধ্যাত্বিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষতো আর আজকাল পাওয়া যায় না। যাদের এই ক্ষমতা আছে তারা তা প্রকাশ করেন না। তারা আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকের যোগাযোগ আছে। আপনি যদি দয়া করে এমন লোকের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে খুব খুশী হব। আছে এমন কেউ?'

'আছে একজন-ময়লা বাবা। গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন।'

'ময়লা মেখে বসে থাকেন কেন?'

'বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করিনি।'

'জিজ্ঞেস করেন নি কেন?'

'জিজ্ঞেস করিনি কারণ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছি। একদিন যাব।'

'হিমু সাহেব ভাই যেদিন যাবেন অবশ্যই আমাকে নিয়ে যাবেন। উনার ক্ষমতা কেমন?'

'লোকমুখে শুনেছি ভাল ক্ষমতা। মনের কথা হড়বড় করে বলে দেন। আপনার মনে কোন খারাপ কথা থাকলে উনার সঙ্গে দেখা না করাই ভাল। হড়বড় করে বলে দেবেন আপনি পড়বেন লজ্জায়।'

উনার নাম কি বললেন, ময়লা বাবা?

'জ্বি ময়লা বাবা।'

'কি ধরণের ময়লা গায়ে মাখেন?'

'এক তৃতীয়াংশ নর্দমার পানির সঙ্গে এক তৃতীয়াংশ ডাস্টবিনের ময়লা, এক ষষ্ঠমাংশ টাটকা গু, প্লাস আরো কিছু হাজিবাজি দিয়ে সেমি সলিড একটা মিকশ্চার তৈরী করে তেলের মত গায়ে মেখে ফেলেন।'

'সত্যি?'

'ভাই আমি রসিকতা করছি। সত্যি কি-না এখনো জানি না। দেখা হলে জানব। ময়লার ফর্মূলা নিয়ে আসব। ইচ্ছা করলে আপনিও গায়ে মাখতে পারেন।'

একজন মানুষ যে অন্য একজনকে কি পরিমান বিরক্ত করতে পারে আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে রাত কাটিয়ে এই তথ্য জেনে গেলাম।

আমি পা গুটিয়ে বিছানায় বসে আছি। তিনি বসে আছেন আমার সামনে একটা বেতের চেয়ারে। তিনি নন ষ্টপ কথা বলে যাচ্ছেন। ঢাকা-চিটাগাং আন্তনগর ট্রেনও কিছু ষ্টেশনে থামে। উনি কোন ষ্টেশনই ধরছেন না। ছুটে চলছে তুফান মেইল। তাঁর সব গল্পই তাঁর কন্যা এবং ভূত -স্ত্রী প্রসঙ্গে। আমি শুনে যাচ্ছি মন দিয়েই শুনছি। অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার বিদ্যা আমার ভালই আয়ত্ত হয়েছে।

'বুঝলেন হিমু ভাই, আজ আমি একজন মুক্ত মানুষ। এ ফ্রী ম্যান। মানে এখনো ফ্রী না তবে হয়ে যাচ্ছি। যেদিন আমার মেয়ে শ্বশুর বাড়ির দিকে রওনা হবে, সেদিনই আমি হব একজন স্বাধীন মানুষ। মেয়েটা সুন্দর হওয়ায় নানান সমস্যা হচ্ছিল। কলেজে উঠার পর থেকে শুধু বিয়ের সম্বন্ধ আসে। শুধু সম্বন্ধ এলে ক্ষতি ছিল না। তারা নানান ভাবে চাপাচাপি করে। ভয় পর্যন্ত দেখায় এমন অবস্থা। বিয়ে না দিলে মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব এই জাতীয় কথাবার্তা পর্যন্ত বলে। শুধু যে ওরা চাপাচাপি করেছে তাই না, আমার আত্মীয় স্বজনরাও চাপাচাপি করেছে। আমি একা মানুষ মেয়ে মানুষ করতে পারছি না এইসব উদ্ভট যুক্তি। যখন বিয়ে দিতে মন ঠিক করলাম তখন অন্য সমস্যা। বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়, ছেলে পছন্দ হয়, কথাবার্তা পাকা হয় তখন বিয়ে ভেঙ্গে যায়। ক'বার এ রকম হল জানেন? পাঁচ বার। এর মধ্যে তিনবার বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে কার্ড দেখাব। সব যত্ন করে রেখে দিয়েছি।'

'বিয়ে ভেঙ্গে যায় কেন?'

'দুষ্ট লোক কানভাঙ্গানি দেয়। আমার মেয়ের নামে আজে বাজে কথা বলে,

উড়ো চিঠি দেয়। টেলিফোন করে। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আজেবাজে ধরণের কথা মানুষ খুব সহজে বিশ্বাস করে। বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আমার মেয়ে এতে খুব কষ্ট পায়। আমি তেমন পাই না, কারণ আমার স্ত্রী আগেই আমাকে জানিয়ে দেন বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। আমার ভেতর এক ধরণের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু আমার মেয়ের ভেতর থাকে না বলে সে খুব কষ্ট পায়। বিয়ে হচ্ছে না এই জন্যে কষ্ট না, অপমানের কষ্ট।'

'কষ্ট হবারই কথা।'

'তারপর সে ঠিক করল কোনদিন বিয়েই করবে না। কঠিন ভাবে আমাদের সবাইকে বলল-তার বিয়ে নিয়ে আর একটি কথাও যেন না বলা হয়। আমার মেয়ে আবার খুব কঠিন ধরণের-একবার যা বলবে তাই। এর কোন নড়চড় হবে না। আমরা বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা দীর্ঘদিন বলিনি। এতদিন পর হঠাৎ আবার কথা উঠল। অতি দ্রুত সব ফাইন্যাল হয়ে গেল।'

'ভালতো।'

'ভালতো বটেই। কি যে আনন্দ আমার হচ্ছে তা আপনাকে বলে বুঝাতে পারব না।'

'আপনার স্ত্রী? তিনিও কি আপনার মতই আনন্দিত?'

'হ্যাঁ সেও খুশী। খুব খুশী।'

'আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জ্বি কথা হয়েছে।'

'তিনি আবার বলেননিতো যে এবারো বিয়ে ভেঙ্গে যাবে?'

'না বলেনি। অবশ্যি সে ভবিষ্যতের কথা খুব আগে ভাগে বলতে পারে না। শেষ মুহূর্তে বলে। কে জানে এইবারও শেষ মুহূর্তে কিছু বলে কি-না।'

'শেষ মুহূর্তে কিছু বলার সুযোগ না দিলেই হয়। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। ধর তক্তা মার পেরেক অবস্থা। কেউ ভাঙ্গানি দেবার সুযোগ পাবে না।'

'তাকি আর হয়। মেয়ের বিয়ে বলে কথা। এতো আর চাইনীজ রেষ্টুরেন্টে ডিনার খাওয়ার মত ঘটনা না যে রাত আটটায় ঠিক করা হবে রাত ন'টায় খেতে যাওয়া হবে।'

'তাও ঠিক।'

'মেয়ের ছবি দেখবেন?'

'নিশ্চয়ই দেখব।'

'সব ছবি দেখতে সময় লাগবে। শত শত ছবি আমি তুলেছি। এক সময় ফটোগ্রাফির শখ ছিল। এখনো আছে। নিয়ে আসব?'

'আনুন।'

'সব মিলিয়ে পঁচিশটা এলবাম।'

'পঁচিশটা এলবাম?'

'জ্বি একেক বছরের জন্যে একেকটা। আসুন এলবাম দেখি। আমি মেয়েকে বলেছি মা শোন, এই বাড়ি থেকে তুই সব কিছু নিয়ে যা শুধু এলাবামগুলি নিতে পারবি না।'

আমরা এলবাম দেখা শুরু করলাম। ছবির উপর দিয়ে শুধু যে চোখ বুলিয়ে যাব সে উপায় নেই-প্রতিটি ছবি আশরাফুজ্জামান সাহেব ব্যাখ্যা করছেন-

'যে ফ্রকটা পরা দেখছেন-তার একটা সাইড ছেড়া আছে। মীরার খুব প্রিয় ফ্রক। ছিড়ে গেছে তারপরেও পরবে। থুতনীতে কাটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন না? বাথরুমে পা পিছলে পরে ব্যথা পেয়েছিল। রক্তারক্তি কাণ্ড। বাসায় গাদাফুল ছিল। সেই ফুল কচলে দিয়ে রক্ত বন্ধ করেছি'

আমরা ভোর চারটা পর্যন্ত সাতটা এলবাম শেষ করলাম। অষ্টম এলাবাম হাতে নিয়ে বললাম, আশরাফুজ্জামান সাহেব কাপড় পরুনতো।

তিনি চমকে উঠে বললেন, কেন?

আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে।

'কি বলছেন এসব?'

'মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি-।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পাঞ্জাবী গায়ে দিলেন।

আমরা ভোর পাঁচটায় ধানমণ্ডিতে মেয়ের মামার বাড়িতে পৌছলাম। দেখা গেল আসলেই মীরার বিয়ে হয়ে গেছে। রাত দশটায় কাজি এনে বিয়ে পড়ানো হয়েছে।

আমি বললাম, মেয়ের বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে ব্যাপারটা কি?

মেয়ের মামা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি বাইরের মানুষ আপনাকে কি বলব, না বলেও পারছি না-মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে যেত তার বাবার কারণে। উনিই পাত্রপক্ষকে উড়ো চিঠি দিতেন। টেলিফোনে নিজের মেয়ের সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলে বিয়ে ভাঙ্গতেন। বিয়ের পর মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে এটা সহ্য করতে পারতেন না। উনি খানিকটা অসুস্থ। আমরা যা করেছি উপায় না দেখেই করেছি।

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমি তাকে রেখে নিঃশব্দে চলে এলাম। সকাল বেলায় হাঁটার অন্যরকম আনন্দ।

ময়লা বাবার আস্তানা কুড়াইল গ্রামে।বুড়িগঙ্গা পার হয়ে রিকশায় দু'কিলোমিটার যেতে হয়। তারপর হন্টন। কাঁচা রাস্তা ক্ষেতের আইল সব মিলিয়ে আরো পাঁচ কিলোমিটার। মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া সহজ ব্যাপার না।

'বাবা' হিসেবে তাঁর খ্যাতি এখনো বোধ হয় তেমন ছড়ায় নি। অল্প কিছু ভক্ত উঠোনে শুকনো মুখে বসে আছে। উঠোনে চাটাই পাতা, বসার ব্যবস্থা। উঠোন এবং টিনের বারান্দা সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যে বাবা সারাগায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন তাঁর ঘর দোয়ার এমন ঝকঝকে কেন-এই প্রশ্ন সংগত কারণেই মনে আসে।

আমার পাশে একজন হাপানির রোগী। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। দেখে মনে হয় সময় হয়ে এসেছে, চোখ মুখ উল্টে এক্ষুণী ভিরমি খাবে। আমি তাতে বিভ্রান্ত হলাম না। হাপানী রোগিকে যত সিরিয়াসই দেখাক এরা এত সহজে ভিরমি খায় না। রোগি আমার দিকে চোখ ইশারা করে বললেন, বাবার কাছে আইছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আপনার সমস্যা কি?"

'সমস্যা কিছু না, ময়লা বাবাকে দেখতে এসেছি। আপনি রোগ সারাতে এসেছেন?"

'জ্বি।'

'বাবার কাছে এই প্রথম এসেছেন?'

'জ্বি।'

'আর কোন বাবার কাছে যান নি? বাংলাদেশেতো বাবার অভাব নেই।'

'কেরামতগঞ্জের নেংটা বাবার কাছে গিয়েছিলাম।'

'লাভ হয় নি?'

'বাবা আমার চিকিৎসা করেন নাই।'

'ইনি করবেন?"

'দেখি আল্লাহপাকের কি ইচ্ছা।'

রোগির হাপানির টান বৃদ্ধি পেল। আমি চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম। মানুষের কষ্ট দেখাও কষ্টের। হাঁপানী রোগীর দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সুস্থ মানুষেরও নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়।

সকাল এগারোটার মত বাজে। বাবার দেখা নেই। উঠোনে রোদ এসে পড়েছে। গা চিড়বিড় করছে। ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে। বাবার খাদেমদের তৎপরতা চোখে পড়ছে। তারা ছেলেদের এক জায়গায় বসাচ্ছে, মেয়েদের এক জায়গায় বসাচ্ছে। সবারই উঠোনে চাটাইয়ে বসতে হচ্ছে তবে চাটাইয়ের মাঝামাঝি চুনের দাগ দেয়া। এই দাগ আগে চোখে পড়ে নি। চোখে সুরমা দেয়া মেয়ে মেয়ে চেহারার এক খাদেমকে নীচু গলায় বললাম, ময়লা-বাবা টাকা পয়সা কি নেন?

খাদেম বিরক্ত মুখে বলল, বাবা টাকা পয়সা নেন না।

'টাকা পয়সা না নিলে উনার চলে কি ভাবে?;

'উনার কি ভাবে চলে সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না।'

'আপনাদেরওতো খরচপাতি আছে। এই যে চোখে সুরমা দিয়েছেন, সেই সুরমাওতো নগদ পয়সায় কিনতে হয়? বাবার জন্যে কিছু পয়সা কড়ি নিয়ে এসেছি, কার কাছে দেব বলেন।'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

'উনি দর্শন দিবেন কখন?'

'জানি না। যখন সময় হবে উনি একজন একজন করে ডাকবেন।'

'সিরিয়েলি ডাকবেন? যে আগে এসেছে সে আগে যাবে?'

'বাবার কাছে কোন সিরিয়েল নাই। যাকে ইচ্ছা বাবা তাকে আগে ডাকেন। অনেকে আসে বাবা ডাকেনও না।'

'আমার ডাকতো তাহলে নাও পরতে পারে। অনেক দূর থেকে এসেছি ভাই সাহেব।'

'বাবার কাছে নিকট-দূর কোন ব্যাপার না।'

'তাতো বটেই নিকট-দূর হল আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্যে। বাবাদের জন্যে না।'

'আপনি বেশি প্যাঁচাল পারতেছেন। প্যাঁচাল পারবেন না, বাবা প্যাঁচাল পছন্দ করেন না। ঝিম ধরে বসে থাকেন। ভাগ্য ভাল হলে ডাক পাবেন।'

আমি ঝিম ধরে বসে রইলাম। আমার ভাগ্য ভাল, বাবার ডাক পেলাম। খাদেম আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, বাবার হুজরাখানা থেকে বের হবার সময় বাবার দিকে পিঠ দিয়ে বের হবেন না। এতে বাবার প্রতি অসম্মান হয়। আপনার এতে বিরাট ক্ষতি হবে।

বাবাদের হুজরাখানা অন্ধকার ধরণের হয়। ধূপ-টুপ জ্বলে। ধূপের ধোয়ায় ঘর বোঝাই থাকে। দরজা জানালা থাকে বন্ধ। ভক্তকে এক ধরণের আদিভৌতিক পরিবেশে ফেলে দিয়ে হকচকিয়ে দেয়া হয়। এটাই নিয়ম। ময়লা বাবার ক্ষেত্রে এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেল। তার হুজরাখানায় দরজা জানালা সবই খোলা। প্রচুর বাতাস। বাবা খালি গায়ে বসে আছেন।

আসলেই গা ভর্তি ময়লা। মনে হচ্ছে ডাস্টবিন উপুর করে গায়ে ঢেলে দেয়া হয়েছে। উৎকট গন্ধে আমার বমি আসার উপক্রম হল। একি কাণ্ড! বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে বাবার চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, এবং তাঁর মুখ হাসি হাসি। কুটিল ধরণের হাসি না, সরল ধরণের হাসি। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে টানা টানা গলায় সুর করে বললেন, কেমন আছেন গো?

আমি বললাম, ভাল।

'দুর্গন্ধ সহ্য হচ্ছে না?'

'জ্বি না।'

'কিছুক্ষণ বসে থাকেন-সহ্য হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ কষ্ট করেন।'

'গায়ে ময়লা মেখে বসে আছেন কেন?'

'কি করব বলেন-নাম হয়েছে ময়লা-বাবা। নামের কারণে ময়লা মাখি। গু মেখে বসে থাকলে ভাল হত। লোকে বলত গু-বাবা। হি হি হি।'

তিনি হাসতে শুরু করলেন। এই হাসি স্বাভাবিক মানুষের হাসি না। অস্বাভাবিক হাসি। এবং খানিকটা ভয় ধরানো হাসি।

'আপনার নাম কি গো বাবা?'

'হিমু।'

'বাহ্ ভাল নাম। সুন্দর নাম-পিতা রেখেছেন?'

'জ্বি।'

'ভাল অতি ভাল। গন্ধ কি এখনো নাকে লাগছে বাবা?'

'এখনো লাগছে।'

'সহ্য হয়ে যাবে। সব খারাপ জিনিসই মানুষের সহ্য হয়ে যায়। আপনার কি অসুখ বিসুখ আছে?'

'না।'

'এত চট করে না বলবেন না। মানুষের অনেক অসুখ আছে যা ধরা যায় না। জ্বর হয় না, মাথা বিষ করে না- তারপরেও অসুখ থাকে। ভয়ংকর অসুখ। এই যে আমি ময়লা মেখে বসে আছি এটা অসুখ না?'

'জ্বি অসুখ।'

'মনের ভেতরে আমরা যখন ময়লা নিয়ে বসে থাকি তখন সেটা অসুখ না, কারণ সেই ময়লা দেখা যায় না, সেই ময়লার দুর্গন্ধ নাই। তাই না বাবা?'

'জ্বি।'

'বাইরের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। এখন আমি যদি গরম পানি দিয়া গোসল দেই। শরীরে সাবান দিয়া ডলা দেই ময়লা দূর হবে। হবে না?'

'হবে।'

'মনের ময়লা দূর করার জন্যে গোসলও নাই, সাবানও নাই।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আপনি আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন–বলেন।'

'শুনেছি আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আপনি মানুষের মনের কথা ধরতে পারেন। সত্যি পারেন কিনা দেখতে এসেছি।'

'পরীক্ষা করতে এসেছেন?"

'পরীক্ষা না। কৌতূহল।'

'শুনেন বাবা আমার কোন ক্ষমতা নাই। ময়লা মেখে বসে থাকি বলে লোকে নানান কথা ভাবে। কেউ কেউ কি করে জানেন? আমার গা থেকে ময়লা নিয়ে যায়। তাবিজ করে গলায় পরে–এতে নাকি তাদের রোগ আরোগ্য হয়—

ডাক্তার কবিরাজ গেল তল
ময়লা বলে কত জল?

হি হি হি -------।'

ময়লা বাবা আবারো অপ্রকৃতস্থের মত হাসতে শুরু করলেন। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম, শুধু শুধু পরিশ্রম করেছি। মানসিক দিক দিয়ে অপ্রকৃস্থ একজন মানুষ। এর কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করা ঠিক না। জ্ঞানগর্ভ কিছু কথা এরা বলে। কিংবা সাধারণ কথাই বলে—পরিবেশের কারণে সেই সাধারণ কথা জ্ঞানগর্ভ কথা বলে মনে হয়।

'ময়লা নিবেন বাবা?'

'জ্বি না।'

'ঢাকা শহর থেকে কষ্ট করে এসেছেন—কিছু ময়লা নিয়ে যান। সপ্তধাতুর কবচে ময়লা ভরবেন। কোমরে কাল ঘুনশি দিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা শরীরে ধারণ করবেন—এতে উপকার হবে।'

'কি উপকার হবে?'

'রাতে বিরাতে যে ভয় পান সেই ভয় কমতে পারে।'

আমি মনে মনে খানিকটা চমকালাম। পাগলা বাবা কি থট রিডিং করছেন? আমার ভয় পাবার ব্যাপারটা তিনি ধরতে পেরেছেন? নাকি কাকতলীয় ভাবে কাছাকাছি চলে এসেছেন। বিস্তৃত ফাঁদ পাতা হয়েছে। আমি সেই ফাঁদে পা দিয়েছি–তিনি সেই ফাঁদ এখন গুটিয়ে আনবেন।

'ভয়ের কথা কেন বলছেন? আমিতো ভয় পাই না।'

'রাতে কোন দিন ভয় পান নাই বাবা?'

'জ্বি না।'

'উনারেতো একবার দেখলেন। ভয়তো পাওনের কথা।'

'কাকে দেখেছি?'

'সেটাতো বলব না। তাঁর হাতে লাঠি ছিল, ছিল না?'

আমি মোটামুটি ভাবে নিশ্চত হলাম ময়লা বাবা থট রিডিং জানেন। কোন একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তিনি আমার মনের কথা পড়তে পারছেন। এটি কি কোন

গোপন বিদ্যা? যে বিদ্যার চর্চা শুধুই অপ্রকৃতস্থ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ময়লা–বাবাকে প্রশ্ন করলে কি জবাব পাওয়া যাবে? মনে হয় না। আমি উঠে দাড়ালাম। ময়লা–বাবা বললেন, বাবা কি চলে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'পরীক্ষায় কি আমি পাশ করেছি?'

'মনে হয় করেছেন। বুঝতে পারছি না।'

'বুঝেছেন বাবা। আমি নিজেও বুঝতে পারি না। খুব কষ্টে আছি। দুর্গন্ধ কি এখনো পাচ্ছেন বাবা?'

'জ্বি না।'

'সুগন্ধ একটা পাচ্ছেন না? সুগন্ধ পাবার কথা। অনেকেই পায়।'

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম–সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার প্রিয় একটা ফুলের গন্ধ। বেলী ফুলের গন্ধ। গন্ধে কোন অস্পষ্টতা নেই–নির্মল গন্ধ। এটা কি কোন ম্যাজিক? আড়কের শিশি গোপনে ঢেলে দেয়া হয়েছে?

'গন্ধ পাচ্ছেন না বাবা?'

'জ্বি পাচ্ছি।'

'ভাল। এখন বলেন দেখি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি?'

ময়লা বাবা আবার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছেন। ম্যাজিশিয়ান ভাল কোন খেলা দেখানোর পর যে ভঙ্গিতে দর্শকের বিস্ময় উপভোগ করে–অবিকল সেই ভঙ্গি। আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।

'কিছু ক্ষমতাতো সবারই আছে। আপনারো আছে।'

'আমি যদি ঢাকা শহরে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই আপনি যাবেন?'

'না।'

'না কেন?'

'অসুবিধা আছে। আপনি বুঝবেন না।'

'তাহলে আজ উঠি।'

'আচ্ছা যান। আপনারে যে খেলা দেখালাম তার জন্যে নজরানা দিবেন না? একশ টাকার নোটটা রেখে যান।'

'শুনেছিলাম আপনি টাকা পয়সা নেন না।'

'সবার কাছ থেকে নেই না। আপনার কাছ থেকে নিব।'

'কেন?'

'সেটা বলব না। সবেরে সব কিছু বলতে নাই। আচ্ছা এখন যান। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি—আর না।'

আমি যদি কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি, তাঁকে কি আপনি আপনার খেলা দেখাবেন?

ময়লা বাবা আবারো অপ্রকৃতস্থের হাসি হাসতে শুরু করলেন। আমি একশ

টাকার নোটটা তাঁর পায়ের কাছে রেখে চলে এলাম। ময়লা বাবার ব্যাপারটা নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সবচে ভাল হত যদি উনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা যেত। সেটা বোধ হয় সম্ভব হবে না। মিসির আলি টাইপের মানুষ সহজে কৌতূহলী হন না। এরা নিজেদের চারপাশে শক্ত পাঁচিল তুলে রাখে। পাঁচিলের ভেতর কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না। এ ধরণের মানুষদের কৌতূহলী করতে হলে পাঁচিল ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতে হয় সেই ক্ষমতা বোধ হয় আমার নেই।

তবু একটা চেষ্টাতো চালাতে হবে। ময়লা বাবার ক্ষমতাকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে বলে দেখা যেতে পারে। লাভ হবে বলে মনে হয় না। অনেক সময় নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি বিভ্রান্ত হবার মানুষ না, তবুও চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

'কে?'

আমি জবাব দিচ্ছি না চুপ করে আছি। দ্বিতীয়বার 'কে?' বললে জবাব দেব। মিসির আলি দ্বিতীয়বার কে বলবেন কিনা বুঝতে পারছি না। আগের বার বলেন নি–সরাসরি দরজা খুলেছেন। আজ আমি মিসির আলি সাহেবের জন্যে কিছু উপহার নিয়ে এসেছি। এক পট ব্রাজিলিয়ান কফি। ইভাপোরেটড মিল্কের একটা কৌটা এবং এক বাক্স সুগার কিউবস। কফি বানিয়ে চায়ের চামচে মেপে মেপে চিনি দিতে হবে না। সুগার কিউব ফেলে দিলেই হবে। একটা সুগার কিউব মানে এক চামচ চিনি। দু'টা মানে দু' চামচ।

উপহার আনার পেছনের ইতিহাসটা বলা যাক। শতাব্দী ষ্টোরে আমি গিয়েছিলাম টেলিফোন করতে। এম্নিতে শতাব্দী ষ্টোরের লোকজনদের ব্যবহার খুব ভাল শুধু টেলিফোন করতে গেলে খারাপ ব্যবহার করে। টেলিফোন নষ্ট মালিকের নিষেধ আছে, চাবি নেই নানান টালবাহানা করে। শেষ পর্যন্ত দেয় তবে টেলিফোন শেষ হওয়া মাত্র বলে পাঁচটা টাকা দেন। কল চার্জ। আজও তাই হল। আমি হাতের মুঠা থেকে পাঁচশ টাকার একটা নোট বের করলাম।

'ভাংতি দেন।'

'ভাংতি নেই। আর শুনুন আপনাকে টাকা ফেরত দিতে হবে না। এখন যে কলটা করেছি সেটা পাঁচশ টাকা দামের কল। আমার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলেছি ওর নাম রূপা। আরেকটা কথা শুনুন ভাই—আমি যতবার আপনাদের এখান থেকে রূপার সঙ্গে কথা বলব ততবারই আপনাদের পাঁচশ করে টাকা দেব। তবে অন্য কলে আগের মত পাঁচ টাকা। ভাই যাই?'

বলে আমি হন হন করে পথে চলে এসেছি— দোকানের এক কর্মচারী এসে আমাকে ধরল। শতাব্দী ষ্টোরের মালিক ডেকেছেন। আমাকে যেতেই হবে না গেলে তার চাকরি থাকবে না।

আমি মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ফিরে গেলাম। নিতান্ত অল্প বয়েসি একটা ছেলে। গোলাপী রঙের হাওয়াই শার্ট পরে বসে আছে। সুন্দর চেহারা। ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের মালিক হিসেবে তাকে মানাচ্ছে না। তাকে সবচে মানাতো যদি টিভির সেটের সামনে বসে ক্রিকেট খেলা দেখতো এবং কোন ব্যাটসম্যান ছক্কা মারলে লাফিয়ে উঠতো।

শতাব্দী ষ্টোরের মালিক আমাকে অতি যত্নে বসাল। কফি খাওয়াল। আমি কফি খেয়ে বললাম, অসাধারণ। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতই অসাধারণ।

সে বলল, কোন কবিতা?

আমি, আবৃত্তি করলাম—

"পুরানো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের পরে,
সবুজ ধানের নিচে–মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে— আঁটির ভিতর থেকে চ'লে গেছে চাষা,
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা!"

শতাব্দী ষ্টোরের মালিক তার এক কর্মচারীকে ডেকে বলল, উনাকে সবচে ভাল কফি এক টিন দাও, ইভাপোরেটেড দুধের একটা টিন, সুগার কিউব দাও।

আমি থ্যাংকস বলে উপহার গ্রহণ করলাম। তারপর ছেলেটা বলল, এখন থেকে দোকানে উনি এলে প্রথম জিজ্ঞেস করবে উনার কি লাগবে। যা লাগবে দিবে। কোন বিল করতে পারবে না। উনি ঢোকা মাত্র আমার ঘরে নিয়ে যাবে। সেখানে টেলিফোন আছে। উনি যত ইচ্ছা টেলিফোন করতে পারবেন।

ব্যবসায়ী মানুষ (তার বয়স যত অল্পই হোক) এমন ফ্রী পাস দেয় না। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। ছেলেটা বলল, আমি আপনাকে চিনি। আপনি হিমু। দোকানের লোকজন আপনাকে চিনতে পারে নি—ওদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। এখন বলুন আপনি কোথায় যাবেন। ড্রাইভার আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

ড্রাইভার আমাকে মিসির আলি সাহেবের বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আমি কড়া নেড়ে অপেক্ষা করছি কখন মিসির আলি সাহেব দরজা খুলেন। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তে ইচ্ছা করছে না। সাধারণ মানুষের বাসা হলে কড়া নাড়তাম, এই বাসায় থাকেন মিসির আলি। কিংবদন্তী পুরুষ। প্রথম কড়া নাড়ার শব্দেই তাঁর বুঝে যাবার কথা, কে এসেছে, কেন এসেছে।

দরজা খুলল। মিসির আলি সাহেব বললেন, কে? হিমু সাহেব?

'জ্বি স্যার।'

'মাথা কামিয়েছেন। আপনাকে ঋষি ঋষি লাগছে।'

আমি ঋষি সুলভ হাসি হাসলাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, আজ এত সকাল সকাল এসেছেন ব্যাপার কি? রাত মোটে ন'টা বাজে। হাতে কি?'

'আপনার জন্যে সামান্য উপহার। কফি, দুধ, চিনি।'

মিসির আলি সাহেবের চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি বললাম, স্যার আপনার রাতের খাওয়া কি হয়ে গেছে?

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'তাহলে আমাকে রান্নাঘরে যাবার অনুমতি দিন আমি আপনার জন্যে কফি

বানিয়ে নিয়ে আসি।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরটা আমার পছন্দ হল। মনে হচ্ছে রান্নাঘরটাই আসলে তাঁর লাইব্রেরী। তিনটা উঁচু বেতের চেয়ার শেলফ ভর্তি বই। রান্না করতে করতে হাত বাড়ালেই বই পাওয়া যায়। রান্নাঘরে একটা ইজিচেয়ারও আছে। ইজিচেয়ারের পায়ের কাছে ফুট রেস্ট। বুঝাই যাচ্ছে ফুট রেস্টে পা রেখে আরাম করে বই পড়ার ব্যবস্থা।

মিসির আলি চুলা ধরাতে ধরাতে বললেন, রান্নাঘরে এত বই পত্র দেখে আপনি কি অবাক হচ্ছেন?

'জ্বি না। আমি কোন কিছুতেই অবাক হই না।'

'আসলে কি হয় জানেন? হয়ত চা খাবার ইচ্ছা হল। চুলায় কেতলি বসালাম। পানি ফুটতে অনেক সময় লাগছে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে খুব খারাপ লাগে। তখন বই পড়া শুরু করি। চুলায় কেতলী বসিয়ে আমি একুশ পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে পানি ফুটে যায়। এই থেকে আপনি আমার বই পড়ার স্পীড সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।'

আমরা কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বসার ঘরে এসে বসলাম। মিসির আলি বললেন, আপনার গলায় কি মাছের কাঁটা ফুটেছে? লক্ষ্য করলাম অকারণে ঢোক গিলছেন।

আমি বললাম, জ্বি।

'শুধু শুধু কষ্ট করছেন কেন? কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করেন— মেডিকেল কলেজের ইমার্জন্সিতে গেলেই ওরা চিমটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবে।'

'আমি কাঁটার যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছি। মানুষতো ক্যানসারের মত ব্যধিও শরীরে নিয়ে বাস করে আমি সামান্য কাঁটা নিয়ে পারব না?'

মিসির আলি হাসলেন। ছেলেমানুষী যুক্তি শুনে বয়স্করা যে ভঙ্গিতে হাসে সেই ভঙ্গির হাসি। দেখতে ভাল লাগে।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি আপনার ভয় পাবার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।'

'রহস্যের সমাধান হয়েছে।'

'ভয়ের কার্য কারণ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করিয়েছি। এইটিই সঠিক ব্যাখ্যা কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ। ব্যাখ্যা শুনতে চান?'

'বলুন।'

মিসির আলি কফির কাপ নামিয়ে সিগারেট ধরালেন। সামান্য হাসলেন। সেই হাসি অতি দ্রুত মুছেও ফেললেন। কথা বলতে শুরু করলেন শান্ত গলায়। যেন তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন। অন্য কারোর সঙ্গে নয়। যেন তিনি যুক্তি

দিয়ে নিজেকেই বুঝানোর চেষ্টা করছেন—

হিমু সাহেব, আমার ধারণা যে ভয়ের কথা আপনি বলছেন—এই ভয় অতি শৈশবেই আপনার ভেতর বাসা বেধেছে। কেউ একজন হয়ত এই ভয়ের বীজ আপনার ভেতর পুতে রেখেছিল যাতে পরবর্তি কোন এক সময় বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। তীব্র ভয় আপনাকে আচ্ছন্ন করে।

অতি শৈশবের তীব্র ভয় অনেক অনেক কাল পরে ফিরে আসে। এটা একটা রিকারিং ফেনোমেনা। মনে করুন তিন বছরের কোন শিশু পানিতে ডুবে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেল। তাকে শেষ মুহূর্তে পানি থেকে উদ্ধার করা হল। সে বেঁচে গেল। পানিতে ডুবার ভয়ংকর স্মৃতি তার থাকবে না। সে স্বাভাবিক ভাবে বড় হবে। কিন্তু ভয়ের এই অংশটি কিন্তু তার মাথা থেকে যাবে না। মস্তিষ্কের স্মৃতি লাইব্রেরীতে সেই স্মৃতি জমা থাকবে। কোন কারণে যদি হঠাৎ সেই স্মৃতি বের হয়ে আসে তাহলে তার সমগ্র চেতনা প্রচণ্ড নাড়া খাবে । সে ভেবেই পাবে না, ব্যাপারটা কি? আপনি কি শৈশবে কখনো পানিতে ডুবেছেন?

'হ্যাঁ চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলাম।'

'ঘটনাটা বলুনতো?'

'ঘটনা আমার মনে নেই। বাবার ডায়েরী পড়ে জেনেছি। আমার বাবা আমাকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা নীরিক্ষা করতেন। মৃত্যু ভয় কি এটা আমাকে বুঝানোর জন্যে তিনি একটা ভয়ংকর পরীক্ষা করেছিলেন। চৌবাচ্চায় পানি ভর্তি করে আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল স্টপ ওয়াচ। তিনি স্টপওয়াচ দেখে পচাত্তুর সেকেণ্ড আমাকে পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।'

'আপনার বাবা কি মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন?'

'এক সময় আমার মনে হত তিনি মানসিক রোগী। এখন তা মনে হয় না। বাবার কথা থাক। আপনি আমার সম্পর্কে বলুন। আমি মানসিক রোগী কিনা সেটা জানা আমার পক্ষে জরুরী।'

'অতি শৈশবের একটা তীব্র ভয় আপনার ভেতর বাসা বেধে ছিল। আমার ধারণা সেই ভয়ের সঙ্গে আরো ভয় যুক্ত হয়েছে। মস্তিষ্কের মেমোরি সেলে ভয়ের ফাইল ভারী হয়েছে। এক সময় আপনি সেই ভয় থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছেন। তখনই ভয়টা মূর্তিমান হয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে চাচ্ছে না আপনি তাকে অস্বীকার করুন।'

'স্যার আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—ঐ রাতে আমি যা দেখেছি সবই আমার কল্পনা?'

'না। বেশীর ভাগই সত্যি। তবে সেই সত্যটাকে কল্পনা ঢেকে রেখেছে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমি বুঝানোর চেষ্টা করছি। ঐ রাতে আপনি ছিলেন খুব ক্লান্ত। আপনার

স্নায়ু ছিল অবসন্ন।''

'খুব ক্লান্ত ছিলাম, স্নায়ু অবসন্ন ছিল বলছেন কেন?'

'আপনার কাছ থেকে শুনেই বলছি। সারারাত আপনি হেঁটেছেন। জোছনা দেখেছেন। তারপর ঢুকলেন গলিতে। দীর্ঘ সময় কোন একটি বিশেষ জিনিশ দেখায় ক্লান্তি আসে। স্নায়ু অবসন্ন হয়।'

'ঠিক আছে বলুন।'

'আপনাকে দেখে কুকুররা সব দাঁড়িয়ে গেল। একটি এগিয়ে এল সামনে তাই না?'

'জ্বি।'

'কুকুরদের দলপতি আবার ঐ ভয়ংকর মূর্তি যখন এল তখন কুকুররা তার দিকে ফিরল। দলপতি এগিয়ে গেল সামনে।'

'দেখুন হিমু সাহেব কুকুররা যা করেছে তা হচ্ছে কুকুরদের জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড। তারা উদ্ভট কিছু করেনি। অথচ তাদের এই স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডই আপনার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কারণ আপনি নিজে স্বাভাবিক ছিলেন না। আপনার মধ্যে এক ধরণের ঘোর কাজ করা শুরু করেছে। শৈশবের সমস্ত ভয় বাক্স ভেঙ্গে বের হয়ে আসা শুরু করেছে।'

'তারপর?'

'আপনি শুনলেন লাঠি ঠক ঠক করে কে যেন আসছে। আপনি যদি স্বাভাবিক থাকতেন তাহলে কিন্তু লাঠির ঠক ঠক শব্দ শুনে ভয়ে অস্থির হতেন না। লাঠি ঠক ঠক করে কেউ আসতেই পারে। আপনি খুবই অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন বলেই এই কাণ্ডটা ঘটেছে। আপনার মস্তিষ্ক অসম্ভব উত্তেজিত। সে বিচিত্র খেলা শুরু করেছে। আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টি সে এলোমেলো করতে শুরু করেছে। আপনি মানুষটা দেখলেন। চাদর গায়ে একজন মানুষ যার চোখ নেই, মুখ নেই। ঠিক না?'

'জ্বি।'

'আমার ধারণা আপনি অ্যাসিডে ঝলসে যাওয়া একজন অন্ধকে দেখেছেন। অন্ধ বলেই সে লাঠি হাতে হাঁটা চলা করে। আপনাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাঠি উঁচু করল আপনার দিকে। একজন অন্ধের পক্ষে আপনার উপস্থিতি বুঝতে পারা কোন ব্যাপার না। অন্ধদের অন্যান্য ইন্দ্রীয় খুব তীক্ষ্ণ থাকে। অবশ্যি অন্ধ না হয়ে একজন কুষ্ঠ রোগীও হতে পারে। কুষ্ঠরোগীও এমন বিকৃত হতে পারে। আমি নিজে কয়েকজনকে দেখেছি।'

আমি বললাম, স্যার একটা কথা, আমি দেখেছি মানুষটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাকে খুব লম্বা দেখাচ্ছিল।

'আপনি যা দেখেছেন তা আর কিছুই না লাইট এণ্ড শেডের একটা ব্যাপার। গলিতে একটা মানুষকে দাঁড়া করিয়ে আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে আলো তার

গায়ে ফেলে পরীক্ষাটা করতে পারেন। দেখবেন আলো কোত্থেকে ফেলছেন, এবং সেই আলো ফেলার জন্যে তার ছায়া কতবড় হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে তাকে কত লম্বা মনে হচ্ছে। একে বলে 'optical illusion' ম্যাজিসিয়ানরা optical illusion এর সাহায্যে অনেক মজার মজার খেলা দেখান।'

'পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে এত সহজ মনে হচ্ছে?'

'জ্বি মনে হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত জটিল সূত্রগুলির মূল কথা খুব সহজ। আপনি যে আপনার মাথার ভেতর শুনলেন কে বলছে ফিরে যাও, ফিরে যাও তার ব্যাখ্যাও খুব সহজ ব্যাখ্যা। আপনার অবচেতন মন আপনাকে ফিরে যেতে বলছিল।'

'আমি কি আপনার সব ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেব না নিজে পরীক্ষা করে দেখব।'

'সেটা আপনার ব্যাপার।'

'আমার কেন জানি মনে হয় ঐ জিনিসটার মুখোমুখি দাড়ানো মানে আমার মৃত্যু। যে আমাকে ছাড়বে না।'

'তাহলেতো আপনাকে অবশ্যই ঐ জিনিসটার মুখোমুখি হতে হবে।'

'যদি না হই?"

'তাহলে সে আপনাকে খুঁজে বেড়াবে। আজ একটা গলিতে সে আছে। কাল চলে আসবে রাজপথে। একটি গলি যেমন আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হয়েছে। তেমনি শুরুতে একটা রাজপথও আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হবে, তারপর আরো একটা। তারপর এক সময় দেখবেন শহরের সমস্ত পথঘাট নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আপনাকে শেষ পর্যন্ত ঘরে আশ্রয় নিতে হবে। সেখানেও যে স্বস্তি পাবেন তা না-মাঝরাতে হঠাৎ মনে হবে দরজার বাইরে ঐ অশরীরি দাঁড়িয়ে, দরজা খুললেই সে ঢুকবে....'

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আপনার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি আপনাকে কি উপদেশ দিতেন?

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, আপনি যে উপদেশ দিচ্ছেন সেই উপদেশই দিতেন। আচ্ছা স্যার আজ উঠি।

'উঠবেন? আচ্ছা—কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মানুষের কি থট রির্ডিং ক্ষমতা আছে?'

'থাকতে পারে। পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের এই ক্ষমতা সম্ভবত আছে। ডিউক ইউনিভার্সিটিতে একবার একটা গবেষণা করা হয়েছিল। পঞ্চাশটা ইঁদুরকে দু'টা থালায় করে খাবার দেয়া হত। একটা থালার নম্বর ১ এবং অন্যটার নম্বর শূন্য। খাবার দেবার সময় মনে মনে ভাবা হত। শূন্য নাম্বার থালার খাবার যে ইঁদুর খাবে তাকে মেরে ফেলা হবে।

দেখা গেল শূন্য নাম্বার থালার খাবার কোন ইঁদুর স্পর্শ করছে না। অথচ একই খাবার।'

'আপনার ধারণা ইঁদুর মানুষের মনের কথা বুঝত বলেই এটা করত?'

'হতে পারে।'

'আপনি থট রিডিং এর ক্ষমতা আছে এমন কোন মানুষের দেখা পাননি?'

'পেয়েছি । তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি নি। নিশ্চিত হতে ইচ্ছাও করে নি। থাকুক না কিছু রহস্য।'

'স্যার যাই।'

'আচ্ছা।'

মিসির আলি সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

আমি রাস্তায় নেমে দেখলাম সুন্দর জোছনা হয়েছে—

কোথায় যাওয়া যায়?

কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। পথে পথে হাঁটতেও ভাল লাগছে না। ভ্রমনের নেশায় মাতাল ভূপর্যটকও কি এক সময় ক্লান্ত হয়ে বলেন হাঁটতে ভাল লাগছে না। পরম শ্রদ্ধেয় সাধু যিনি প্রতি সন্ধ্যায় মুন্ডিত মস্তকে বৎসদের নানান জ্ঞানের কথা বলেন তিনিও কি এক সময় ক্লান্ত হয়ে বলেন, আর ভাল লাগছে না। মানুষের শরীর যন্ত্রে দু'টি তার। একটিতে ক্রমাগতই বাজে-'ভাল লাগছে' 'ভাল লাগছে'। অন্যটিতে বাজে "ভাল লাগছে না", "ভাল লাগছে না"। দু'টি তার এক সঙ্গেই বাজতে থাকে। একটি উঁচু স্বরে উদারায় অন্যটি মন্দ্র সপ্তকে। কারো কারো কোন একটি তার ছিড়ে যায়। আমার বেলায় কি হচ্ছে? 'ভাল লাগছে' তারটি কি ছিড়ে গেছে?

ঘরে ফিরে যাব? চারদেয়ালে নিজেকে বন্দ করে ফেলব? সেই ইচ্ছাও করছে না। আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সন্ধানে রওনা হলাম। তিনি কি কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন? মনে হয় না। অতি আদরের মানুষের অবহেলা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ বড়ই অভিমানী প্রাণী।

আশরাফুজ্জামান সাহেব বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখে যন্ত্রের মত গলায় বললেন, কেমন আছেন?

আমি বললাম, ভাল আছি। আপনি কি করছেন?

'কিছু করছি না। শুয়ে ছিলাম।'

'শরীর খারাপ?"

'জ্বি না শরীর খারাপ না। শরীর ভাল।'

'খাওয়া দাওয়া করেছেন?'

'জ্বি না। রান্না করিনি।'

'আপনার কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?

'জ্বি না। ওরা চিটাগাং গেছে। ওর শ্বশুর বাড়ি চিটাগাং।'

'যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যায় নি?'

'আমাকে নেবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল, আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না।'

'আমি আপনাকে নিতে এসেছি।'

'কোথায় নিয়ে যাবেন।'

'তেমন কোথাও না। পথে পথে হাঁটব। জোছনা রাতে পথে হাঁটতে অন্যরকম লাগে যাবেন?'

'জ্বি না।'

'পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি আপনার মেয়ের গল্প করবেন, আমি শুনব। তার সব গল্প শোনা হয় নি। যাবেন?'

'আচ্ছা চলুন।'

আমরা পথে নামলাম। ঠিক করে ফেললাম তাঁকে নিয়ে প্রচুর হাঁটব। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন— শরীর যতই অবসাদগ্রস্ত হবে মন ততই হালকা হবে।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি মেয়ের উপর খুব রাগ করেছি। আসলে রাগ করি নি। কারণ রাগ করব কেন বলুন, আমিতো আসলেই তার বিয়ে ভেঙ্গেছি। উড়োচিঠি দিয়েছি, টেলিফোনে খবর দিয়েছি।'

'নিজের ইচ্ছায়তো করেন নি। আপনার স্ত্রী আপনাকে করতে বলেছেন আপনি করেছেন।'

'খুবই সত্যি কথা, কিন্তু আমার মেয়ে বিশ্বাস করে না। তার মা'র সঙ্গে যে আমার কথাবার্তা হয় এটাও বিশ্বাস করে না।'

'অল্প বয়সে সবকিছু অবিশ্বাস করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার মেয়ের কোন দোষ নেই। আমার আত্মীয় স্বজনরা ক্রমাগত তার কানে মন্ত্রণাদেয়। আমি যে কি ধরনের মন্দলোক এটা শুনতে শুনতে সেও বিশ্বাস করে ফেলেছে।'

'আপনি মন্দলোক?'

'ওদের কাছে মন্দলোক। মেয়ে অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে নেই না। নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি করি। এইসব আর কি....'

'ওরাতো জানে না, আপনি যা করেন স্ত্রীর পরামর্শে করেন।'

'জানে। ওদের বলেছি কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না।'

'মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?'

'জ্বি না।'

'আশ্চর্যতো।'

'আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়েছি। আজ সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিলাম। সে থাকলে অবশ্যই কথা বলতো। সে নেই।'

'আশরাফুজ্জামান সাহেব এমনওতো হতে পারে যে তিনি কোনকালেই ছিলেন না। আপনার অবচেতন মন তাঁকে তৈরী করেছে। হতে পারে না?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব জবাব দিলেন না। মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগলেন।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব।'

'জ্বি।'

'ক্ষিধে লেগেছে?"

'জ্বি।'

'আসুন খাওয়া দাওয়া করি।'

'আপনি খান। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব। আপনার সঙ্গে ঘুরতে ভাল লাগছে না। আপনাকে আমি পছন্দ করতাম কারণ আমার ধারণা ছিল আপনি আমার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেন।'

'আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করি বা না করি—আপনাকেতো করি। সেটাই কি যথেষ্ট না?'

'না।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হন হন করে এগুচ্ছেন। আমার খুব মায়া লাগছে। রাগ ভাঙ্গিয়ে ভদ্রলোককে রাতের ট্রেনে তুলে দেয়া যায় না? তূর্ণা নিশিথায় তুলে দেব। সেই ট্রেন চিটাগাং পৌছায় ভোররাতে। আশরাফুজ্জামান সাহেব ট্রেন থেকে নেমে দেখবেন ষ্টেশনে তাকে নিতে মেয়ে এবং মেয়ে জামাই দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবের সব গল্পের সুন্দর সুন্দর সমাপ্তি থাকলে ভাল হয়। বাস্তবের গল্পগুলি সমাপ্তি ভাল না। বাস্তবের অভিমানী বাবারা নিজেদের অভিমান এত সহজে ভাঙ্গে না। রূপকথার মত সমাপ্তি বাস্তবে হয় না।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব! এক সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড়ানতো।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়ালেন। আমি দৌড়ে তাঁকে ধরলাম।

'চলুন আপনাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দি।'

'দরকার নেই। আমি বাসা চিনে যেতে পারবো।'

'আপনার জন্যে বলছি না। আমি আমার নিজের জন্যে বলছি। আমার একটা সমস্যা হয়েছে আমি একা একা রাতে হাঁটতে পারি না। ভয় পাই।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব শান্তগলায় বললেন, চলুন যাই।

আমরা হেঁটে হেঁটে ফিরছি কেউ কোন কথা বলছি না। আশরাফুজ্জামান সাহেবের গাল চকচক করছে। তিনি কাঁদছেন। কান্নাভেজা গালে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

চোখের জলে চাঁদের ছায়া আমি এই প্রথম দেখছি। অদ্ভুততো! ভেজা গালে

চাঁদের আলো নিয়ে কি কোন কবিতা লেখা হয়েছে? কোন গান?

'আশরাফুজ্জামান সাহেব।'

'জ্বি।'

'মেয়ের উপর রাগ কমেছে?'

'ওর উপর আমার কখনো রাগ ছিল না। আচ্ছা হিমু সাহেব আজ কি পূর্ণিমা?'

'জ্বিনা। আজ পূর্ণিমা না। পূর্ণিমা'র জন্যে আপনাকে আরো তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, একা একা জীবনটা কি ভাবে কাটাব বুঝতে পারছি না। বিষ খেয়ে মরে গেলে কেমন হয় বলুনতো?

'মন্দ হয় না।'

'মেয়েটা কষ্ট পাবে। মেয়েটা ভাববে তার উপর রাগ করে বিষ খেয়েছি।'

'তাকে সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে যাবেন। ভালমত সব ব্যাখ্যা করবেন। তাহলেই হবে। তারপরেও কষ্ট পাবে। সেই কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হবে না।'

'দীর্ঘস্থায়ী হবে না কেন?'

'আপনার মেয়ে তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তার সংসারে ছেলেপুলে আসবে। কারো হাম হবে, কারোর হবে কাশি। ওদের বড় করা, স্কুলে ভর্তি করানো, হোমওয়ার্ক করানো, ঈদে নতুন জামা কেনা, অনেক ঝামেলা। দোকানের পর দোকান দেখা হবে ফ্রকের ডিজাইন পছন্দ হবে না। এত সমস্যার মধ্যে কে আর বাবার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাবে।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হেসে ফেললেন। সহজ স্বাভাবিক হাসি। মনে হচ্ছে তার মন থেকে কষ্টবোধ পুরোপুরি চলে গেছে।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনি মানুষটা খুব মজার।'

'মজার মানুষ হিসেবে আপনাকে মজার একটা সাজেশান দেব?'

'দিন।'

'চলুন আমরা কমলাপুর রেল ষ্টেশনে চলে যাই। আপনি তূর্ণা নিশিথায় চেপে বসুন। অন্ধকার থাকতে থাকতে চিটাগাং রেল ষ্টেশনে নামবেন। নেমেই দেখবেন আপনার মেয়ে এবং মেয়ে জামাই দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ের চোখ ভর্তি জল। সে ছুটে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে।'

আশরাফুজ্জামান শব্দ করে হাসলেন। আমি বললাম, হাসছেন কেন?

'আপনার উদ্ভট কথাবার্তা শুনে হাসছি।'

'পৃথিবীটা ভয়ংকর উদ্ভট। কাজেই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা—মাঝে মধ্যে করা যায়।'

'সবচে বড় কথা কি জানেন হিমু সাহেব? এখন বাজছে রাত বারোটা! তূর্ণা নিশিথায় চলে গেছে।'

'আমার মনে হচ্ছে যায় নি। লেট করছে।'

'শুধু শুধু লেট করবে কেন?'

'লেট করবে—কারণ এই ট্রেনে চেপে এক অভিমানী পিতা আজ রাতে তাঁর কন্যার কাছে যাবেন। আমি নিশ্চিত আজ ট্রেন লেট।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ আমি নিশ্চিত। কারণ আমি হচ্ছি হিমু। পৃথিবীর রহস্যময়তা আমি জানি। ট্রেন যে আজ লেট হবে এই বিষয়ে আপনি বাজি ধরতে চান?'

'হ্যাঁ চাই। বলুন কি বাজি?'

'ট্রেন যদি সত্যি সত্যি লেট হয় তাহলে আপনি সেই ট্রেনে চেপে বসবেন।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কি করবেন। আমি বেবীটেক্সির সন্ধানে বের হলাম। দেরী করা যাবে না— অতি দ্রুত কমলাপুর রেল ষ্টেশনে পৌছতে হবে। আন্তনগর ট্রেন অনন্তকাল কারোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে না।

ট্রেন লেট ছিল।

আমরা যাবার পনেরো মিনিট পর ট্রেন ছাড়ল। চলন্ত ট্রেনের জানালা থেকে প্রায় পুরো শরীর বের করে আশরাফুজ্জামান সাহেব আমার দিকে হাত নাড়ছেন। তার মুখ ভর্তি হাসি, কিন্তু গাল আবারো ভিজে গেছে। ভেজা গালে ষ্টেশনের সরকারী ল্যাম্পের আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে চাঁদের আলো।

ঘুম ভাঙতেই প্রথম যে কথাটা আমার মনে হল তা হচ্ছে—'আজ পূর্ণিমা'। ভোরের আলোয় পূর্ণিমার কথা মনে হয় না। সূর্য ডুবার পরই মনে হয়—রাতটা কেমন হবে? শুক্লাপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ? আমি অন্যান্যদের মতই দিনের আলোয় চাঁদের পক্ষ নিয়ে ভাবি না। কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। আজ রাতের চাঁদের সঙ্গে আমার এপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ মধ্যরাতে আমি সেই বিশেষ গলিটার সামনে দাঁড়াব। লাঠি হাতের ঐ মানুষটার মুখোমুখি হব। মিসির আলির ধারণা— সে আর কিছুই না সাধারণ রোগগ্রস্ত একজন মানুষ। কিংবা এক অন্ধ। চাঁদের আলোয় লাঠি হাতে যে বের হয়ে আসে। চাঁদের আলো তাকে স্পর্শ করে না।

আমার ধারণা তা না। আমার ধারণা সে অন্য কিছু। তার জন্ম এই ভুবনে না, অন্য কোন ভুবনে। যে ভুবনের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। তার জন্ম আলোতে নয়— আদি অন্ধকারে।

জানালার কাছে একটা কাক এসে বসেছে। মাথা ঘুরিয়ে সে আমাকে দেখছে। তার চোখে রাজ্যের কৌতূহল। আমি দিনের শুরু করলাম কাকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

'হ্যালো মিষ্টার ক্রো, হাউ আর ইউ?'

কাক বলল—কা কা।

তার ধ্বনির অনুবাদ আমি মনে মনে করে নিলাম। সে বলছে, ভাল আছি। তুমি আজ এত ভোরে উঠেছ কেন? কাঁথা গায়ে শুয়ে থাক। মানব সম্প্রদায়ে তোমার জন্ম। তুমি মহাসুখিজনদের একজন। খাবারের সন্ধানে সকাল থেকে তোমাকে উড়তে হয় না।

আমি বললাম, মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক দুঃখ আছেরে পাখি। অনেক দুঃখ।

'দুঃখের চেয়ে সুখ বেশী।'

'জানি না। আমার মনে হয় না।'

'আমার মনে হয়— এই যে তুমি এখন উঠবে। এক কাপ গরম চা খাবে। একটা সিগারেট ধরাবে—এই আনন্দ আমরা কোথায় পাব। আমাদেরওতো মাঝে মাঝে চা খেতে ইচ্ছে করে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই।'

আমি বিছানা থেকে নামলাম। দু' কাপ চায়ের কথা বলে বাথরুমে ঢুকলাম। হাতমুখ ধুয়ে নতুন একটা দিনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। আজকের দিনটা আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত আমি পরিচিত সবার সঙ্গে কথা বলব। দিনটা খুব আনন্দে কাটাব। সন্ধ্যার পর দীঘির পানিতে গোসল করে নিজেকে পবিত্র করব— তারপর চাঁদের আলোয় তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। হাতে মুখে পানি দিতে দিতে দ্রুত চিন্তা করলাম— কাদের সঙ্গে আমি কথা বলব—

রূপা

আজ তার সঙ্গে কথা বলব প্রেমিকের মত। তাকে নিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাটিও করা যেতে পারে। একগাদা ফুল কিনে তার বাড়িতে উপস্থিত হব। রক্তের মত লাল রঙের গোলাপ।

ফুপা-ফুপু

তাঁরা কি কক্সবাজার থেকে ফিরেছেন? না ফিরে থাকলে টেলিফোনে কথা বলতে হবে। কক্সবাজারে কোন হোটেলে উঠেছেন তাওতো জানিনা। বড় বড় হোটেল সব ক'টায় টেলিফোন করে দেখা যেতে পারে।

মিসির আলি

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। দুপুরের খাওয়াটা তাঁর সঙ্গে খেতে পারি। তাঁকে আজ রাতের এপয়েন্টমেন্টের কথাটা বলা যেতে পারে.....

আচ্ছা দিঘী কোথায় পাব? ঢাকা শহরে সুন্দর দিঘী আছে না। কাকের চোখের মত টলটলে পানি।

'স্যার চা আনছি।'

আমি চায়ের কাপ নিয়ে বসলাম। এক কাপ চা জানালার পাশে রেখে দিলাম— মিঃ ক্রো যদি খেতে চান খাবেন।

আশ্চর্য কাকটা ঠোঁট ডুবাচ্ছে গরম চায়ে। কক কক করে কি যেন বলল। ধন্যবাদ দিল বলে মনে হচ্ছে। পশু পাখির ভাষাটা জানা থাকলে খুব ভাল হত। মজার মজার তথ্য অনেক কিছু জানা যেত। পশু পাখির ভাষা জানাটা খুব কি অসম্ভব? আমাদের এক নবী ছিলেন না যিনি পশুপাখির কথা বুঝতেন? হযরত সুলাইমান আলায়হেস সালাম। তিনি পাখিদের কথা বলতেন। কোরান শরীফে আছে— পিঁপড়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। একটা পাখিও তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল, পাখির নাম হুদ হুদ। সূরা সাদে তার সুন্দর বর্ণনা আছে।

হুদ হুদ পাখি এসে বলল, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি, যা আপনার জানা নেই। আর আমি 'সেবা' থেকে আসল খবর নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম যে জাতির উপর রাজত্ব করছে। তার সবই আছে, এবং আছে এক বিরাট সিংহাসন।"

হুদ হুদ পাখি বলেছিল সেবার রাণীর কথা। কুইন অব সেবা— 'বিলকিস'। হুদ হুদ পাখিটা দেখতে কেমন? কাক নয়তো?

কাকটা চায়ের কাপ উল্টে ফেলেছে। তার ভাবভঙ্গিতে অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করছি। কেমন আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে— যেন বলার চেষ্টা করছে, Sir I am sorry, extremely sorry, I have broken the cup.

না Broken the cup হবে না, কাপ ভাঙ্গেনি শুধু উল্টে ফেলেছে। চায়ের কাপ উল্টেফেলার ইংরেজী কি হবে? রূপাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। শতাব্দী ষ্টোর থেকে কিছু টেলিফোন করে দিনের শুরুটা করা যাক।

শতাব্দী ষ্টোরের লোকজন আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তিনজন এসে জিজ্ঞেস করল, স্যার কেমন আছেন? একজন এসে অতি যত্নে মালিকের ঘরে নিয়ে বসাল। টেলিফোনের চাবি খুলে দিল। আমি বসতে বসতেই কফি চলে এল, সিগারেট চলে এল। পীর ফকিররা যে কত আরামে জীবন যাপন করেন তা বুঝতে পারছি। শতাব্দী ষ্টোরের মালিক উপস্থিত নেই, কিন্তু আমার কোন সমস্যা হচ্ছে না।

'হ্যালো এটা কি রূপাদের বাড়ি?'

'কে কথা বলছেন?'

'আমার নাম হিমু।'

'রূপা বাড়িতে নেই। বান্ধবীর বাসায় গেছে।'

'এত সকালে বান্ধবীর বাড়িতে যাবে কি ভাবে। এখনো ন'টা বাজেনি। রূপাতো আটটার আগে ঘুম থেকেই উঠে না।'

'বলেছিতো ও বাসায় নেই।'

'আপনিতো মিথ্যা বলছেন। আপনার গলা শুনেই বুঝতে পারছি আপনি একজন দায়িত্বশীল বয়স্ক মানুষ—আপনি দিনের শুরু করেছেন মিথ্যা দিয়ে এটাকি ঠিক হচ্ছে? আপনি চাচ্ছেন না, রূপা আমার সঙ্গে কথা বলুক— সেটা বললেই হয়— শুধু শুধু মিথ্যা বলার প্রয়োজন ছিল না।'

'ষ্টপ ইট।'

'ঠিক আছে স্যার ষ্টপ করছি। রূপাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম— আমার মনে হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করলেও হবে। আচ্ছা স্যার চায়ের কাপ উল্টে ফেলার ইংরেজী কি?'

খট করে শব্দ হল। ভদ্রলোক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি এখন যা করবেন তা হচ্ছে টেলিফোনের প্লাগ খুলে রাখবেন। এবং হয়তোবা মেয়েকে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। ভদ্রলোকের প্রচুর মিথ্যা কথা আজ সারাদিনে বলতে হবে। মিথ্যা দিয়ে যিনি দিনের শুরু করেন, তাঁকে দিনের শেষেও মিথ্যা বলতে হয়।

আমি ফুপুর বাসায় টেলিফোন করলাম। ফুপুকে পাওয়া গেল। তিনি রাগে চিড়বিড় করে জ্বলছেন।

'কে হিমু! আমারতো সর্বনাশ হয়ে গেছে শুনেছিস কিছু?'

'না, কি হয়েছে?'

'রশীদ হারামজাদাটাকে বাসায় রেখে গিয়েছিলাম, সে টিভি, ভিসিআর সব নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আমার আলমীরাও খুলেছে। সেখান থেকে কি নিয়েছে এখনো বুঝতে পারছি না।'

'মনে হয় গয়না টয়না নিয়েছে।'

'না গয়না নিতে পারবে না। সব গয়না ব্যাংকের লকারে। ক্যাশ টাকা নিয়েছে। তোর ফুপার একটা বোতলও নিয়েছে। খুব দামী জিনিশ না—কি ছিল। তোর ফুপা হায় হায় করছে।'

'এই দেখ ফুপু সব খারাপ দিকের একটা ভাল দিকও আছে। রশীদ তোমার চক্ষুশূল একটা জিনিসও নিয়ে গেছে।'

'ফাজলামী করিস না— পয়সা দিয়ে একটা জিনিশ কেনা।'

'ফ্রীজে তোমাদের জন্যে চিতল মাছের পেটি রান্না করা ছিল না?'

'হ্যাঁ ছিল। তুই জানলি কি করে?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস। পরে বলব, এখন বল কক্সবাজারে কেমন কাটল।'

'ভালই কাটছিল মাঝখানে সাদেক গিয়ে উপস্থিত হল।'

'মামলা বিষয়ক সাদেক?'

'হ্যাঁ। দেখ না যন্ত্রণা তাকে ঠাট্টা করে কিনা কি বলেছি— সে সত্যি সত্যি মামলা টামলা করে বিশ্রী অবস্থা করেছে। বেয়াই বেয়ানের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। ছিঃ ছিঃ।'

'তোমার বেয়াই বেয়ান কেমন হয়েছে?'

'বেয়াই সাহেবতো খুবই ভাল মানুষ। অসম্ভব রসিক। কথায় কথায় হাসছিলেন। তোর ফুপার সঙ্গে তার খুবই খাতির হয়েছে। চারজনে মিলে নরক গুলজার করেছে।'

'চারজন পেলে কোথায়? ফুপা আর তাঁর বেয়াই দু'জন হবে না?'

'এদের সাথে দুই ছাগলাওতো আছে— মফাজ্জল আর জহিরুল।'

'এই দুইজন এখনো ঝুলে আছে?'

'আছেতো বটেই। তবে শোন ছেলে দু'টাকে যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ না।'

'ভাল কাজ কি করেছে?'

'সাদেককে শিক্ষা দিয়েছে। আমি তাতে খুব খুশি হয়েছি। সাদেক সবার সামনে মামলা নিয়ে হৈ চৈ শুরু করল, ওয়ারেন্ট নাকি বের হয়ে গেছে এইসব। আমি লজ্জায় বাঁচি না। কি বলব কিছু বুঝতেও পারছি না তখন মফাজ্জল এসে ঠাশ করে সাদেকের গালে এক চড় বসিয়ে দিল।'

'সেকি?'

'খুবই আকস্মিক ঘটনা, আমি খুব খুশি হয়েছি। উচিত শিক্ষা হয়েছে। ছোট লোকের বাচ্চা। আমাকে মামলা শেখায়।'

'মফাজ্জল আর জহিরুল মনে হচ্ছে তোমাদের পরিবারে এন্ট্রি পেয়ে গেছে?'

'এন্ট্রি পাওয়ার কি আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মায়া পড়ে গেছে এটা বলতে পারিস।'

'আমাদের সর্বনাশ করল এই মায়া। আমরা বাস করি মায়ার ভেতর আর চেঁচিয়ে বলি আমাদেরকে মায়া থেকে মুক্ত কর।'

'জ্ঞানের কথা বলবি না হিমু। চড় খাবি।'

'জ্ঞানের কথা না ফুপু। আমার সহজ কথা হচ্ছে মায়া সর্বগ্রাসী। এই যে রশীদ তোমার এত বড় ক্ষতি করল তারপরেও সে যখন মিডিল ইষ্ট থেকে ফিরবে, জায়নামাজ, তসবি এবং মিষ্টি তেতুল নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তুমি কিন্তু খুশিই হবে। তুমি হাসি মুখে বলবে— কেমন আছিসরে রশীদ?'

'ঐ হারামজাদা কি মিডিল ইষ্ট যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুই এতসব জানলি কি করে?'

'জ্বি আশ্চর্য আমি জানব না? আমি হচ্ছি হিমু।'

'তুই ফাজিল বেশী হয়েছিস। তোকে ধরে চাপকানো উচিত হাসছিস কেন?'

'বাদল এবং আঁখি এরা কেমন আছে?'

'ভালই আছে। কক্সবাজারে ওরা যে কাণ্ডটা করেছে—আমারতো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা।'

'কি করেছে?'

'আরে, দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা হোটেলের দরজা বন্ধ করে বসা। আমরা এতগুলি মানুষ এসেছি সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই। ডাইনিং হলে সবাই খেতে বসি ও খবর পাঠায়— জ্বর জ্বর লাগছে। আসতে পারবে না। খাবার যেন

পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমার পেটের ছেলে যে এত নির্লজ্জ হবে ভাবতেই পারি না।'

'ফুপু!'

'বল কি বলবি?'

'সত্যি করে বলতো ওদের এই ভালবাসা দেখে আনন্দে তোমার মন ভরে গেছে না? কি কথা বলছ না কেন? তোমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল—তুমি এবং ফুপা তোমরা কি একই কাণ্ড করো নি?'

'আমরা এত বেহায়া ছিলাম না।'

'আমারতো ধারণা তোমরাও ছিলে।'

'তোর ফুপা অনেক বেহায়াপনা করেছে। বুদ্ধি কম মানুষতো বাদদে ঐ সব।'

'না বাদ দেব না। তোমরা কি ধরণের বেহায়াপনা করেছ তার একটা উদাহরণ দিতেই হবে। জাষ্ট ওয়ান।'

'হিমু!'

'জ্বি ফুপু!'

'তুই এত ভাল ছেলে হয়েছিস কেন বলতো?'

'আমি কি ভাল ছেলে?'

'অবশ্যই ভালছেলে। তুই আমার একটা কথা শোন— ভালদেখে একটা মেয়েকে বিয়ে কর। তারপর তুই বৌমাকে নিয়ে নানান ধরণের বেহায়াপনা করবি— আমরা সবাই দূর থেকে দেখে হাসব।'

'ফুপু রাখি?' বলে আমি খট করে রিসিভার রেখে দিলাম। কারণ কথা বলতে বলতে ফুপু কেঁদেফেলেছেন, এটা আমি বুঝতে পারছি— মাতৃশ্রেণীর মানুষের কান্নাভেজা গলার আহ্বান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয় নি। সেই আহ্বান এই কারণেই শোনা ঠিক না।

মিসির আলি বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ?

আমি বললাম, জ্বি না।

'দেখে মনে হচ্ছে খুব শরীর খারাপ। আপনি কি কোন কারণে টেনশান বোধ করছেন?'

'স্যার আজ পূর্ণিমা।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। আপনি তাহলে ভয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'আপনি যদি চান— আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।'

'না আমি চাচ্ছি না।'

'দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছেন?'

'জ্বি না।'

'আমার সঙ্গে চারটা খান। খাবার অবশ্যি খুবই সামান্য। খিচুরি, আর ডিমভাজা। খাবেন?'

'জ্বি খাব।'

'হাত মুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার সাজাই।'

'দু'জনের মত খাবার কি আছে?'

'হ্যাঁ আছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আজ সকালে ঘুম ভেঙ্গেই মনে হল— দুপুরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আপনি আমার এখানে আসবেন। এইসব টেলিপ্যাথিক ব্যাপারের কোন গুরুত্ব আমি দেই না— তারপরেও দু'জনের খাবার রান্না করেছি। কেন বলুনতো?'

'বলতে পারছি না।'

'আমাদের মনের একটা অংশ রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। আমরা অনেক কিছুই জানি— তারপরেও অনেক কিছু জানি না। বিজ্ঞান বলছে— " Out of nothing, nothing can be created" তারপরেও আমরা জানি শূন্য থেকেই এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি তৈরী হয়েছে। যা একদিন হয়তোবা শূন্যেই মিলিয়ে যাবে। ভাবলে ভয়াবহ লাগে বলে ভাবি না।'

'স্যার আপনার খিচুড়ি খুব ভাল হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। হিমু সাহেব!'

'জ্বি স্যার?'

'আপনি যদি মনে করেন ঐ জিনিশটার মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না তাহলে বাদ দিন।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'বুঝতে পারছি না কেন বলছি। আমার লজিক বলছে— আপনার উচিত ভয়ের মুখোমুখি হওয়া আবার এই মুহূর্তে কেন জানি মন সায় দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে মস্ত কোন বিপদ আপনার সামনে।'

আমি হাসিমুখে বললাম, এরকম মনে হচ্ছে কারণ আপনি আমার প্রতি এক ধরণের মায়া অনুভব করছেন। যখন কেউ কারো প্রতি মমতাবোধ করতে থাকে তখনই সে লজিক থেকে সরে আসতে থাকে। মায়া, মমতা, ভালবাসা যুক্তির বাইরের ব্যাপার।'

'ভাল বলেছেন।'

'এটা আমার কথা না। আমার বাবার কথা। বাবার বাণী। তিনি তাঁর বিখ্যাত বাণীগুচ্ছ তাঁর পুত্রের জন্যে লিখে রেখে গেছেন।'

'আমি কি সেগুলি পড়ে দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ পারেন। আমি বাবার খাতাটা নিয়ে এসেছি। আপনাকে দিয়ে যাব।

তবে একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'আমি যদি কোনদিন ফিরে না আসি আপনি খাতার লেখাগুলি পড়বেন। আর যদি কাল ভোরে ফিরে আসি, আপনি খাতা না পড়েই আমাকে ফেরত দেবেন।'

'খুব জটিল শর্ততো না।'

'না শর্ত আপনার জন্যে জটিল না। আমার জন্যে জটিল।'

মিসির আলি হাসলেন। নরম গলায় বললেন, ঠিক আছে।

আমি খাওয়া শেষ করে, খাতা তাঁর হাতে দিয়ে বের হলাম। ঘুম পাচ্ছে। পার্কের বেঞ্চীতে শুয়ে লম্বা ঘুম দেব। যখন জেগে উঠব তখন যেন দেখি চাঁদ উঠে গেছে।

ঘুমভেঙ্গে একটু হকচকিয়ে গেলাম। আমি কোথায় শুয়ে আছি? সব কিছু খুব অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে গহীন কোন অরণ্যে শুয়ে আছি। চারদিকে সুনসান নীরবতা। খুব হাওয়া হচ্ছে-হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে। অসংখ্য পাতা এক সঙ্গে কেঁপে উঠলে যে অস্বাভাবিক শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয় সে রকম শব্দ। ব্যাপারটা কি? আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তাকালাম চারদিকে। না যা ভাবছিলাম তা না।

আমি সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের একটা পরিচিত বেঞ্চিতেই শুয়েছিলাম। গাছের পাতার শব্দ বলে যা ভাবছিলাম তা আসলে গাড়ি চলাচলের শব্দ। এতবড় ভ্রান্তিও মানুষের হয়?

আকাশে চাঁদ থাকার কথা না? কই চাঁদ দেখা যাচ্ছে না তো। পাক অন্ধকার। পার্কের বাতি কখন জ্বলবে? ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি পূর্ণিমার রাতে শহরের সব বাতি জ্বালায় না। চাঁদইতো আছে-সব বাতি জ্বলানোর দরকার কি? এরকম ভাব।

পূর্ণিমার প্রথম চাঁদ হলুদ বর্ণের থাকে। আকারেও সেই হলুদ চাঁদটাকে খুব বড় লাগে। যতই সময় যায় হলুদ রঙ ততই কমতে থাকে। এক সময় চাঁদটা ধবধবে শাদা হয়ে আবারো হলুদ হতে থাকে। দ্বিতীয়বার হলুদ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয় মধ্যরাতের পর। আজ আমার যাত্রা মধ্যরাতে। আমি আবারো চাঁদ দেখার চেষ্টা করলাম।

'কি দেহেন?'

আমি চমকে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। ঝুপড়ির মত জায়গায় মেয়েটা বসে আছে। নিশিকন্যাদের একজন। যে গাছের গুড়িতে সে হেলান দিয়ে আছে সেটা একটা কদম গাছ। আমার প্রিয় গাছের একটি। রুবিয়েসি পরিবারের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম-এনথোসেফালাস কাদাম্বা। গাছটা দেখলেই গানের লাইন মনে পড়ে-বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান।

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কি নাম?

সে 'থু' করে থুথু ফেলে বলল, কদম।

আসলেই কি তার নাম কদম? না সে রসিকতা করছে, কদম গাছের নিচে বসেছে বলে নিজের নাম বলছে কদম। বিচিত্র কারণে এ ধরণের মেয়েরা রসিকতা করতে পছন্দ করে। পৃথিবী তাদের সঙ্গে রসিকতা করে বলেই বোধহয়,

খানিকটা রসিকতা তারা পৃথিবীর মানুষদের ফেরত দেয়।

'তোমার নাম কদম?'

'হ।'

'যখন নারিকেল গাছের গুরিতে হেলান দিয়ে বস তখন তোমার নাম কি হয়? নারকেল?'

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। এখন আর তাকে নিশিকন্যাদের একজন বলে মনে হচ্ছে না। পনেরো ষোল বছরের কিশোরীর মত লাগছে যে সন্ধ্যাবেলা একা একা বনে বেড়াতে এসেছে। হাসি খুব অদ্ভুত জিনিশ। হাসি মানুষের সব গ্লানি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

'আমার নাম-ছফুরা।'

'ছফুরার চেয়েতো কদম নামটাই ভাল।'

'আচ্ছা যান, আফনের জন্যে কদম।'

'একেক জনের জন্যে একেক নাম? ভাল তো।'

'আফনের ভাল লাগলেই আমার ভাল।'

মেয়েটা গাছের নীচ থেকে উঠে এসে আমার পাশে বেঞ্চীতে বসে হাই তুলল। মেয়েটার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তারপরেও মনে হচ্ছে দেখতে মায়া কাড়া। কৈশোরের মায়া মেয়েটি এখনো ধরে আছে। বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে না। কদম শাড়ি পরে আছে। শাড়ির আঁচলে বাদাম। সে বাদাম ভেঙ্গে ভেঙ্গে মুখে দিচ্ছে।

'এট্টু পরে পরে আসমানের দিকে চাইয়া কি দেহেন?'

'চাঁদ উঠেছে কি-না দেখি।'

'চাঁদের খোঁজ নিতাছেন ক্যান? আফনে কি চাঁদ সওদাগর?'

কদম আবারো খিলখিল করে হাসল। আমি মেয়েটির কথার পিঠে কথা বলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম।

'রাগ হইছেন?'

'রাগ হব কেন?'

'এই যে আফনেরে নিয়া তামশা করতেছি।'

'না রাগ হই নি।'

'আমার ভিজিট পঞ্চাশ টেকা।'

'পঞ্চাশ টাকা ভিজিট?'

'হ।'

'ভিজিট দেবার সামর্থ আমার নেই। এই দেখ পাঞ্জাবীর পকেট পর্যন্ত নেই।'

'পঞ্চাশ টেকা আপনের কাছে বেশী লাগতেছে?'

'না। পঞ্চাশ টাকা বরং কম মনে হচ্ছে-

রমণীর মন সহস্র বৎসরের সখা সাধনার ধন।'

'আপনের কাছে আসলেই টেকা নাই?'

'না।'

'সত্য বলতেছেন?'
'হ্যাঁ। আর থাকলেও লাভ হত না।'
'ক্যান মেয়ে মানুষ আফনের পছন্দ হয় না?'
'হয়। হবে না কেন?'
'আমার চেহারা ছবি কিন্তু ভাল। আন্ধাইর বইল্যা বুঝতেছেন না। যখন চাঁদ উঠব-তহন দেখবেন।'
'তাহলে বস অপেক্ষা কর। চাঁদ উঠুক।'
'আফনের কাছে ভিজিটের টেকা নাই। বইস্যা থাইক্যা ফয়দা কি?'
'কোন ফয়দা নেই।'
'আফনে এইখানে কতক্ষণ থাকবেন?'
'বুঝতে পারছি না, ভালমত চাঁদ না উঠা পর্যন্ত হয়ত থাকব।'
'তাইলে আমি এট্টু ঘুরাণ দিয়া আসি?'
'আসার দরকার কি?'
'আচ্ছা যান আসব না। আমার ঠেকা নাই।'
'ঠেকা না থাকাই ভাল।'
'বাদাম খাইবেন?'
'না।'
'ধরেন খান। ভাল বাদাম। না-কি খারাপ মেয়ের হাতের জিনিশ খান না?'

কদম আঁচলের বাদাম বেঞ্চিতে ঢেলে দ্রুত পায়ে চলে গেল। আমি বসে বসে বাদাম খাচ্ছি। একটা হিসাব নিকাশ করতে পারলে ভাল হত—আমি আমার এক জীবনে কত মানুষের অকারণে মমতা পেয়েছি, এবং কতজনকে সেই মমতা ফেরত দিতে পেরেছি। মমতা ফেরত দেবার অংশগুলি মনে থাকে। মমতা পাবার অংশগুলি মনে থাকে না। কিছুদিন পর মনেই থাকবে না কদম নামের একটি পথের মেয়ে নিজের অতি কষ্টের টাকায় কেনা বাদাম আমাকে খেতে দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন পথে নামব, ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষের দিকে তাকাব সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে—বক্তা ভাই এবং বক্তা ভাইয়ের পুত্রকে আমি একবার একটা শ্লীপিং ব্যাগ উপহার দিয়েছিলাম।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। হলুদ রঙের কুৎসিত একটা চাঁদ। চাঁদটাকে সাজবার সময় দিতে হবে। তার সাজ সম্পন্ন হোক, তারপর আমি বের হব। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি তারপরেও চোখ থেকে ঘুম যাচ্ছে না। বেঞ্চীতে আবার শুয়ে থাকা যাক। আমি শুয়ে পড়লাম। মশা খুব উৎপাত করছে, তবে কামড়াচ্ছে না। বনের মশারা কামড়ায় না। পার্কের সব বাতি জ্বলে উঠেছে। গাছপালার সঙ্গে ইলেকট্রিকের আলো একেবারেই যায় না। ইলেকট্রিকের আলোয় মনে হচ্ছে গাছগুলির অসুখ করেছে। খারাপ ধরণের কোন অসুখ।

আমি অপেক্ষা করছি।

কিসের অপেক্ষা? আশ্চর্যের ব্যাপার আমি অপেক্ষা করছি কদম নামের মেয়েটার জন্যে। সে আসবে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। আলোর

অভাবে তার মুখ ভাল করে দেখা হয়নি। এইবার দেখা হবে। সে কোথায় থাকে সেই জায়গাটাওতো দেখে আসা যায়। মেয়েটার নিজের কি কোন সংসার আছে? পাইপের ভেতরের একার এক সংসার। যে সংসার সে খুব গুছিয়ে সাজিয়েছে। পুরানো ক্যালেন্ডারের ছবি দিয়ে চারদিক সাজানো। ছোট্ট ধবধবে শাদা একটা বালিশ। বালিশে ফুল তোলা। অবসরে সে নিজেই সুই সূতা দিয়ে ফুল তুলে নিজের নাম সই করেছে—কদম।

না কদম না। মেয়েটার নাম হল ছফুরা। নামটা কি আমার মনে থাকবে? আজ মধ্যরাতের পর আবারো যদি ফিরে আসি ছফুরা মেয়েটিকে খুঁজে বের করব। তাকে নিয়ে তার সংসার দেখে আসব। কথাগুলি মেয়েটাকে বলে যেতে পারলে ভাল হত। রাত বাড়ছে, মেয়েটা আসছে না। সে হয়ত আর আসবে না।

কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। কুয়াশা ক্রমেই ঘন হচ্ছে। আমি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

এখন মধ্যরাত।

আমি দাঁড়িয়ে আছি গলির সামনে। ঐতো কুকুরগুলি শুয়ে আছে। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যই আগের মত। কোন বেশ কম নেই। যেন আমি সিনেমা হলে বসে আছি। দেখা ছবি দ্বিতীয়বার আমাকে দেখানো হচ্ছে। ঐ রাতে কুকুরগুলির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। কি কথা বলেছিলাম? মনে পড়ছে না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

পড়েছে। মনে পড়েছে। আমি বলেছিলাম--তারপর তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? মন মরা হয়ে শুয়ে আছ।

না এই বাক্যগুলি বলা যাবে না। কুকুররা এখন আর শুয়ে নেই। ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শরীর শক্ত হয়ে আছে। তারা কেউ লেজ নাড়ছে না। তারা হঠাৎ চমকে উল্টো দিকে ফিরল। এখন আর এদের কুকুর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তি। আমি যেন হঠাৎ প্রবেশ করেছি—প্রাণহীন পাথরের দেশে। যে দেশে সময় থেমে গেছে। লাঠির ঠক ঠক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আসছে, সে আসছে।

মাথার ভেতরটা টালমাটাল করছে। ফিস ফিস করে কে যেন কথা বলছে। গলার স্বর খুব পরিচিত, কিন্তু অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে বলে চিনতে পারছি না। চাপা ও গম্ভীর গলায় কে যেন ডাকছে, হিমু হিমু!

'বলুন শুনতে পাচ্ছি।'
'আমি কে বল দেখি।'
'বুঝতে পারছি না।'
'আমি তোর বাবা।'
'আপনি আমার বাবা নন। আপনি আমার অসুস্থ মনের কল্পনা। আমি প্রচণ্ড

ভয় পাচ্ছি বলেই আমার মন আপনাকে তৈরি করেছে। আমাকে সাহস দেবার চেষ্টা করছে।'

'এইগুলিতো তোর কথা নারে ব্যাটা। এগুলি মিসির আলির হাবিজাবি। তুই চলে আয়। চলে আয় বলছি।'

'না।'

'শোন হিমু। তুই তোর মা'র সঙ্গে কথা বল। এইবার আমি একা আসিনি। তোর মা'কে নিয়ে এসেছি।'

'কেমন আছ মা?'

অদ্ভুত করুণ এবং বিষণ্ণ গলায় কেউ একজন বলল, ভাল আছি।

'মা শোন-তোমার চেহারা কেমন আমি জানি না। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তুমি দেখতে কেমন। তুমি কি জান আমার জন্মের পর পর বাবা তোমার সব ছবি নষ্ট করে ফেলেন যাতে কোনদিনই আমি জানতে না পারি তুমি দেখতে কেমন ছিলে।'

'এতে একটা লাভ হয়েছে না? তুই যে কোন মেয়ের দিকে তাকাবি তার ভেতর আমার ছায়া দেখবি।'

'মা তুমি দেখতে কেমন?'
'অনেকটা কদম মেয়েটার মত।'
'ওকে আমি দেখতে পাইনি।'
'জানি। হিমু শোন—তুই ঘরে ফিরে যা।'
'না।'
'তোর বাবা তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে-তার সব স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে।'

লাঠির ঠক ঠক আরো স্পষ্ট হল। মালার কথাবার্তা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। লাঠির শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে এখন আর কোন শব্দ নেই। দেখা যাচ্ছে—কুৎসিত ঐ জিনিশটাকে দেখা যাচ্ছে। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে—ঐতো সে লাঠি উঁচু করল। চাঁদের আলোয় তার ছায়া পড়ে নি। একজন ছায়া শূন্য মানুষ।

আমি পা বাড়ালাম। কুকুররা সরে গিয়ে আমার যাবার পথ করে দিল। আমি এগুচ্ছি। আর মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরই আমি তার মুখোমুখি হব। আচ্ছা শেষবারের মত কি চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখব—আজ রাতের জোছনাটা কেমন?